রুদ্ধকারার অন্তরালে

শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায় এম্. এ.

মূল্য বার আনা

প্রথম প্রকাশ—অগ্রহায়ণ ১৩৫৭

প্রকাশক—শ্রীতারক চন্দ্র গুহ

সত্যব্রত লাইব্রেরী

১৯৭নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্

কলিকাতা—৬

মুদ্রাকর—শ্রীউপেন্দ্র মোহন বিশ্বাস

আই, এন, এ, প্রেস

১৭৩নং রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট্

কলিকাতা—৬

প্রস্তাবনা

ভারতবর্ষ আজ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। এই স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য ভারতবর্ষ কি কঠোর সাধনাই না করিয়াছে, কত ত্যাগস্বীকার করিয়াছে, কত কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়া ভারতবাসীর জীবন অতিবাহিত হইয়াছে। শত সহস্র দেশপ্রেমিক ভারতের স্বাধীনতার সাধনাকে জয়যুক্ত করিবার জন্য আত্মাহুতি দিয়াছেন, দুর্ব্বিষহ কারাজীবনের লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ বা খ্যাতনামা রাজনীতিবিদ্, কেহ বা বিখ্যাত ন'ন। সেই সকল অতি-পরিচিত বা অ-পরিচিত, কয়েকজন মাত্র রাজনৈতিক বন্দীর কারাবাসের বিচিত্র অভিজ্ঞতা এই বইয়ে ব্যক্ত করিলাম। বিগত যুগের দেশনেতা ও দেশ-নেত্রীদের জীবনের আলেখ্য এ যুগের ছেলেমেয়েদের সামনে একটা উজ্জ্বল আদর্শ

স্থাপন করুক ও অনুপ্রেরণা জাগ্রত করুক—এই উদ্দেশ্যে গ্রন্থখানি রচিত।

পুরানো দিনের বাঁশির সুরের করুণ রাগিণীটুকু এই কাহিনীর মধ্যদিয়া শুনা যাইবে। স্বাধীনতা সংগ্রামের নরনারীরা কি পরিমাণ দুঃখ এবং কি পরিমাণ অপমান বরণ করিয়া "শিকল দেবীর পূজাবেদী"কে চুর্ণ করিয়া স্বাধীনতার অরুণোদয় সূচিত করিয়াছিলেন, সে কাহিনী গল্পের মতই চিত্তাকর্ষক করিয়া বর্ণনা করিবার চেষ্টা আগাগোড়াই করিয়াছি।

—গ্রন্থকার—

সূচীপত্র

বিষয়			পৃষ্ঠা
১। অরবিন্দ ঘোষ	...	...	১
২। মহাত্মা গান্ধী	...	...	১২
৩। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু	...	...	২৮
৪। সুভাষচন্দ্র বসু	...	...	৪৯
৫। বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত	...	...	৫৯
৬। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	...	৭৫
৭। ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী	...	...	১০০

আজ আমরা যে স্বাধীন ভারতবর্ষে বাস করিতেছি, তাহার পিছনে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নেতাদের দীর্ঘকালের সাধনা ও আন্দোলন যেমন কাজ করিয়াছে,—ভারতের বিপ্লববাদী এবং সন্ত্রাসবাদী নেতাদের জীবনপণ সংগ্রামও সেইরূপ আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে যে সাফল্য-মণ্ডিত করিয়াছে, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সন্ত্রাসবাদী নেতাদের নেতৃত্বে বাংলার তরুণেরা একদিন অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা লইয়া বোমা তৈয়ারী করিয়াছে, বন্দুক, রিভলভার চালাইয়াছে, চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসকের সেনাবাহিনীর সহিত বীরের মত যুদ্ধ করিয়াছে। এই রকম নানা উপায়ে সন্ত্রাসবাদী কাজের মধ্য দিয়া বিদেশী শাসনে অত্যাচারিত ভারতবাসীর

মনের বিক্ষোভ একদিন প্রকাশ পাইয়াছিল। বিদেশী শাসন-কালে শাসকবর্গের অত্যাচার-উৎপীড়ন এবং অন্যায় শাসন যত বাড়িত, বিপ্লববাদীদের বিপ্লবাত্মক কাজের মধ্য দিয়া ভারতের দলিত অন্তরাত্মা তত বেশী প্রতিবাদ জানাইত। সে একটা মনে রাখিবার মত যুগ গিয়াছে—সে যুগ ভারত ইতিহাসের অগ্নিযুগ।

বাংলার মাটিতে এই বিপ্লবাত্মক কাজকর্ম আর সন্ত্রাসবাদ একদিন খুব প্রবল হইয়া দেখা দিয়াছিল। ইহাতে ইংরেজ শাসকেরা বিচলিত হইয়াছিলেন, মুষ্টিমেয় তরুণ বিপ্লববাদীর কার্যকলাপে তাঁহারা সেদিন প্রমাদ গণিয়াছিলেন। যে সকল নেতার কাছ হইতে উৎসাহ অনুপ্রেরণা পাইয়া বাংলার এই বিপ্লবের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়া ভারতের স্বাধীনতার জয়রথকে চালাইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ একজন।

১৯০৭-৮ সাল। সেই সময়ে বাংলার সকল জায়গায় বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের সন্তানদের মত বাংলার ছেলেরা গুপ্ত সমিতি স্থাপন করিয়াছে, আর সেই সব সমিতিতে তাহারা নানারকমের শিক্ষার মধ্য দিয়া দেশের জন্য প্রাণ দিবার মহাব্রত গ্রহণ করিতেছে। পরাধীনতার পীড়া, দাসত্বের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সেই সময়ে তরুণদলের হৃদয়-মন দলিত-মথিত করিয়া, তাহাদিগকে বিপ্লবের পথে ঠেলিয়া দিয়াছে। স্বাধীনতার স্বপ্নে তন্ময় হইয়া তাহারা তখন কল্পনা করিতে

সুরু করিয়াছে—ভারত স্বাধীনতা লাভ করিবে, জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবে। আশায় উৎসাহে তরুণ বাংলার ছেলেদের মন তখন পরিপূর্ণ।

এমনি সময়ে ক্ষুদিরাম বসু কিংসফোর্ড সাহেবকে হত্যা করিতে গিয়া ভুল করিয়া দুইজন ইংরাজ মহিলার গাড়ীর উপর বোমা ফেলিল—ইংরাজ মহিলা দুইটি নিহত হইলেন। বাংলার সর্বত্র বিপ্লববাদীদের ধরপাকড় সুরু হইল। ক্ষুদিরামও ধরা পড়িল।

ইতিপূর্বেই বিপ্লবী নেতা বলিয়া অরবিন্দ ইংরেজ শাসকদের নজরে পড়িয়াছিলেন। ফরাসীদেশে স্বাধীনতার জন্য যে বিপ্লব হইয়াছিল, অরবিন্দ দেশের তরুণদলকে সেই বিপ্লবের কথা বলিয়া তাহাদিগকে অনেক দিন হইতে বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দিতেছিলেন। মেদিনীপুরে নিজের হাতে বন্দুক ছোঁড়া শিখাইয়া তিনি এক গুপ্ত সমিতির প্রবর্তন করেন। সন্ত্রাসবাদ প্রচারের জন্য বোমা তৈয়ারী করার ব্যাপারেও অরবিন্দ লিপ্ত ছিলেন, এ সন্দেহ ব্রিটিশ শাসকবর্গের তখন হইয়াছিল। সুতরাং অরবিন্দও গ্রেপ্তার হইলেন।

বিচারাধীন অরবিন্দকে কারাবাসে রাখা হইল।

অরবিন্দের নির্জন কারাগৃহটি ছিল নয় ফুট দীর্ঘ, পাঁচ-ছয় ফুট প্রস্থ। ইহার জানালা ছিল না। সামনে মোটা লোহার গরাদ—এই পিঞ্জরে তাঁহার বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল। ঘরের

বাহিরে একটি ছোট উঠান। উঠানটি পাথরে বাঁধান, উঠানের চারিদিকে ইটের উঁচু দেয়াল, সেখানে কাঠের দরজা। সেই দরজার উপরে মানুষের চোখের আকারের গোল ছেঁদা। দরজা বন্ধ হইলে ঐ ছেঁদায় চোখ লাগাইয়া প্রহরী মধ্যে মধ্যে দেখে কয়েদী কি করিতেছে।

জেলের কয়েদী অরবিন্দের থাকিবার ঘরটি মনুষ্যবাসের অযোগ্য ছিল, সেখানকার সাজ-সরঞ্জামও সেইরূপ অযোগ্য ছিল। একখানি থালা, আর একটি বাটি ঘরের অন্যতম আসবাব ছিল, উত্তমরূপে মাজা হইলে তাঁহার এই সর্বস্বরূপ থালা বাটির এমন রূপার মত চাকচিক্য হইত যে তাহা দেখিয়া অরবিন্দের চোখ জুড়াইয়া যাইত। কিন্তু দুঃখের বিষয় থালাটির তলা সমান ছিল না। তাই থালাটায় একটু জোরে আঙ্গুল দিলেই তাহা আরব্যোপন্যাসের দরবেশের মত বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিতে থাকিত। তখন অরবিন্দের পক্ষে এক হাতে আহার করা, আর এক হাতে থালাটা ধরিয়া থাকা ভিন্ন আর উপায় থাকিত না। কারণ, থালাটি ধরিয়া না খাইলে, উহা ঘুরপাক খাইতে খাইতে জেলের অতুলনীয় মুষ্টিপরিমাণ ভাত লইয়া পলাইয়া যাইবার উপক্রম করিত।

থালা হইতে বাটিটি অরবিন্দের আরও প্রিয় ও উপকারী জিনিস ছিল। কারণ বাটিটি অরবিন্দের সকল কাজে লাগিত। উহার জাত-বিচার ছিল না। ঐ বাটিতে করিয়া তাঁহাকে

শৌচক্রিয়া করিতে হইত, উহাতে করিয়াই তিনি আবার ডাল তরকারি আহার করিতেন, উহাতে করিয়াই তাঁহাকে আঁচাইতে হইত, জলপান করিতে হইত। এমন সর্বকর্মক্ষম মূল্যবান্ বস্তু ইংরেজের জেলেই পাওয়া সম্ভব।

ঐ বাটি এবং থালা ছাড়া, অরবিন্দের ঘরের মধ্যে স্নানের জন্য একটি টিনের বালতি ছিল এবং দুটি জেলের কম্বল। স্নানের বালতি উঠানে থাকিত এবং সেইখানে অরবিন্দ স্নান করিতেন। তাঁহার ভাগ্যে প্রথমতঃ জলকষ্ট ছিল না, পরে তাহা ঘটিয়াছিল। অধিকাংশ আসামীকেই ঐ এক বালতি জলেই শৌচক্রিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া বাসন মাজা ও স্নান সারিতে হইত। কি শীতে কি গ্রীষ্মে প্রায় প্রত্যহই স্নানের সময়ে জল ফুরাইয়া আসিত, আর তখন সামান্যমাত্র জলে অরবিন্দকে এবং অন্যান্য কয়েদীদিগকে কাকের স্নান করিয়া সন্তুষ্ট হইতে হইত।

স্নানের ব্যবস্থা অপেক্ষা পানীয় জলের ব্যবস্থা ছিল আরও চমৎকার! অরবিন্দ যখন কয়েদ ছিলেন, তখন গরমকাল। তাঁহার ছোট ঘরে বাতাস প্রায় ঢুকিত না বলিলেই হয়। কিন্তু মে মাসের জ্বলন্ত আগুনের মত গরম রৌদ্র অবাধে তাঁহার ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া ঘরখানিকে তাতাইয়া যেন একটি আগুনের চুল্লি বানাইয়া তুলিত। সেই আগুনে তাতিয়া সিদ্ধ হইবার উপক্রম যখন হইত, তখন অরবিন্দকে পান করিতে

হইত ঐ টিনের বালতির গরম জল। বার বার তিনি উহা পান করিতেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার তৃষ্ণা মিটিত না। বরং ঐরকম গরম জল খাইয়া ক্রমাগত ঘাম বাহির হইত, আর নূতন করিয়া তৃষ্ণায় আকুল হইয়া উঠিতেন।

কোন কোন কয়েদীর উঠানে মাটির কলসী ছিল। যাহাদের উঠানে এইরূপ পানীয় জলের জন্য মাটির কলসী থাকিত তাহাদের বড় ভাগ্য। তাঁহারা মনে করিতেন যে, পূর্বজন্মের বহু ভাগ্যের ফলে তাঁহারা এইভাবে ঠাণ্ডা জল পাইবার অধিকারী হইয়াছেন। জেলের মধ্যে কাহারও ভাগ্যে এইরকম ঠাণ্ডা জল, কাহারও ভাগ্যে বা অতৃপ্ত তৃষ্ণা—ইহা লক্ষ্য করিয়া ঘোর নাস্তিককেও অদৃষ্ট মানিতে হইত। পিপাসা পাইলেই গরম জল খাইতে হইত বলিয়া অরবিন্দ ক্রমশ জল পান করার অভ্যাস কমাইতে কমাইতে সম্পূর্ণরূপে তৃষ্ণামুক্ত হইতে পারিয়াছিলেন।

সেই গরম আগুনের কুণ্ডের মত ঘরে তাঁহার বিছানা ছিল দুইটা মোটা জেলের কম্বল। বালিশ মিলিত না। সুতরাং একটি কম্বল পাতিয়া, আর একটি কম্বল পাট করিয়া বালিশ বানাইয়া তাঁহাকে শুইতে হইত। যখন গরম অসহ্য হইত তখন মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া শরীর শীতল করিয়া তিনি আরাম লাভ করিতেন। মাতা বসুন্ধরার কোলের পরশ যে কত শীতল, কত সুখকর তাহা এই সময়ে বেশ উপলব্ধি

করিতে পারিতেন। তবে জেলের মাটির মেঝে তেমন কোমল নয়। কাজেই অল্পকালমধ্যে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়া সেখানে পুনরায় কম্বলের বিছানারই আশ্রয় লইতে হইত। দারুণ গরমে কম্বলের বিছানায় শুইয়া গা জ্বালা করিত, গরমে প্রাণ বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম হইত। অথচ কঠিন মেঝে শীতল হইলেও সেখানে বেশিক্ষণ শুইয়া থাকা চলিত না।

যেদিন বৃষ্টি হইত, সেদিন বড় আনন্দের হইত। তবে বৃষ্টির দিনে অসুবিধারও অন্ত ছিল না। ঝড়বৃষ্টি হইলেই বাহিরে ধূলা পাতা ও প্রভঞ্জনের তাণ্ডব নৃত্যের পরে অরবিন্দের খাঁচার মত ঘরটির মধ্যে একটি ছোট-খাট জলপ্লাবন হইত। তারপর সেই জলপ্লাবিত মাটি যতক্ষণ না শুকাইত, ততক্ষণ ঘুমের আশা ত্যাগ করিয়া অরবিন্দকে ঠায় বসিয়া থাকিতে হইত। তবু বৃষ্টিকে তিনি সাদরে অভ্যর্থনা করিতেন, কারণ—ঐ রকম ঝড়ের দিনেই তাঁহার খাঁচার মত ঘরটির মধ্যে প্রচুর-পরিমাণে হাওয়া আসিত এবং তাহাতে তাঁহার ঘরটির নিদারুণ তাত বিদূরিত হইত।

জেলের আহারও ছিল অদ্ভুত। মোটা ভাত, তাহাতেও খোলা, কঙ্কর, পোকা, চুল, ময়লা ইত্যাদি কতপ্রকার মশলা যে সংযুক্ত হইত তাহার আর ইয়ত্তা নাই। স্বাদহীন ডালে জলের ভাগই থাকিত অধিক। তরকারীর মধ্যে ঘাস-পাতা শুদ্ধ শাক। মানুষের আহার যে এত নিঃসার হইতে পারে—ইতিপূর্বে অরবিন্দের

তাহা ধারণা ছিল না। শাকের কালো কয়লার মত মূর্তি দেখিয়া অরবিন্দ প্রথম দিনেই তাহাকে ভক্তিপূর্ণ নমস্কার করিয়া বর্জন করিয়াছিলেন।

জেলখানায় সকল কয়েদীর ভাগ্যে একই তরকারী জুটিত এবং সেখানে একবার কোন তরকারী রান্না এবং তাহার পরিবেশন আরম্ভ হইলে, অনন্তকাল ধরিয়া তাহা চলিতে থাকিত।

অরবিন্দ যখন কয়েদ হইয়াছিলেন, তখন শাকের রাজত্ব ছিল। সুতরাং দিন যায়, পক্ষ যায়, মাস যায়—দুই বেলা শাকের তরকারী আর ডাল ভাত। জিনিসটা বদলান ত দূরের কথা, নূতন তরকারী দেওয়া ত দূরের কথা—সেই শাকের তরকারী আর ডাল ভাতের চেহারার পর্য্যন্ত এতটুকু পরিবর্ত্তন দেখা যাইত না। শাকের তরকারী আর ডালের সেই নিত্য সনাতন অনাদ্যন্ত অপরিণামাতীত অদ্বিতীয় রূপ দেখিয়া জগৎটা যে মায়াময় পরিবর্তনশীল—এ ধারণা অরবিন্দের মন হইতে দূর হইয়া গিয়াছিল।

শুধু আহারের অসুবিধা নহে—নিশ্চিন্তে নিদ্রাভোগ করাও কারাবাসের নিয়ম ছিল না। কারণ, তাহাতে কয়েদীর আরাম-প্রিয়তা বাড়িয়া যাইতে পারে। সেই জন্য নিয়ম ছিল যে, যতবার পাহারা বদলাইত ততবারই হাঁক-ডাক করিয়া কয়েদী-দিগকে জাগাইয়া দেওয়ার প্রথা ছিল। ঘুমন্ত কয়েদী সিপাহীর হাঁক-ডাকে জাগিয়া উঠিয়া সাড়া না দেওয়া পর্য্যন্ত

ছাড়িত না—সে হাঁকিয়াই চলিত। সাড়া দিলে তবে থামিত।

সিপাহীরা অরবিন্দকে উঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিত, বাবু ভাল আছেন ত। গভীর রাত্রিতে ঘুম ভাঙ্গাইয়া ডাকিয়া তুলিয়া এইরূপ কুশল জিজ্ঞাসা সকল সময়ে বড় আনন্দের হইত না। তবু কয়েকদিন বড় বিরক্ত হইয়াও অরবিন্দ এইরূপ অত্যাচার সহ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষে তিনি ধমক দিতে সুরু করিলেন। দুই চারিবার ধমক দিতে দিতে তিনি দেখিলেন যে, ধমকের সুফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। রাত্রে সেইরকম ডাকিয়া ডাকিয়া কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার প্রথা ক্রমশ উঠিয়া গেল। অরবিন্দ রেহাই পাইলেন।

জেলখানার আর একটি ভয়াবহ জিনিস লফসী। যিনি একবার সুসভ্য ব্রিটিশ জাতির হোটেলে পদার্পণ করিয়াছেন, তিনি এই অপূর্ব জিনিসটিকে ভুলিতে পারিবেন না।

লফসীর অর্থ ফেনের সহিত সিদ্ধ ভাত। ইহাই কয়েদীর ছোট হাজরী। লফসীর তিন অবস্থা বা ত্রিমূর্তি আছে। প্রথমত লফসীর অমিশ্রিত মূলপদার্থ—শুদ্ধ শিব শুভ্রমূর্তি। দ্বিতীয়—লফসীর সোনার বরণ—ডালে সিদ্ধ, খিচুড়ী নামে অভিহিত। তাহাতে কি যে না থাকিত তাহা বলা যায় না। অর্থাৎ নানান্ অখাদ্যের মিশ্রণে এই অদ্ভুত খাদ্যবস্তুটি তৈয়ারী হইত। তৃতীয়—লফসীর রাজকীয় রূপ, অল্প গুড়ে

মিশ্রিত, ধূসর বর্ণ। এই জিনিসটি তবু কোনরকমে গলাধঃকরণ করা যাইত। অন্য দুই মূর্তিকে মুখে দিতে গিয়া অন্নপ্রাশনের ভাত উঠিয়া আসিতে চাহিত।

বলা বাহুল্য যে, এই লফসীই একহিসাবে দেখিতে গেলে বাঙ্গালী কয়েদীর একমাত্র পুষ্টিকর খাদ্য। জেলখানায় আর যতরকম খাবার দেওয়া হয় তাহার সবই অসার। কিন্তু লফসী সারবান্ খাদ্য হইলে হইবে কি? তাহার যেরূপ স্বাদ অথবা বর্ণ, তাহাতে তাহা কেবল ক্ষুধার চোটেই খাওয়া যায়, —তাহাও কত জোর করিয়া, মনকে কত বুঝাইয়া।

জেলের নিঃসঙ্গ জীবনে সেখানে শুইয়া শুইয়া বাহিরের দৃশ্য দেখিতে অরবিন্দের খুব ভাল লাগিত। আলিপুরের জেলে আনীত হইবার আগে তিনি যখন লালবাজারের হাজতে ছিলেন তখন সেখানকার নির্জনতা তাঁহাকে ব্যথিত করিত—বাহিরের প্রকৃতি অথবা মানুষ কিছুই দেখিতে পাইতেন না বলিয়া তাঁহার অন্তর ব্যথিত হইয়া উঠিত। লালবাজারে দোতলার ঘরের অতি উচ্চ জানালা দিয়া বাহিরের আকাশ অরবিন্দ দেখিতে পাইতেন না। বাহিরের জগতে যে গাছপালা ঘর-বাড়ী, পশু-পক্ষী, মানুষ আছে তাহা কল্পনা করাই তাঁহার পক্ষে তখন কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু আলিপুরের জেলে উঠানের গরাদ দেওয়া দরজার মধ্য দিয়া বাহিরে দৃষ্টিকে প্রসারিত করিয়া দিতে পারা যাইত। উঠানের

দেয়ালের একপাশে একটি গাছ ছিল। তাহার শ্যামলিমায় অরবিন্দের চোখ জুড়াইয়া যাইত। পাশের গোয়ালঘরের কয়েদীরা ঘরের সমুখ দিয়া গরু চরাইতে লইয়া যাইত। গরু ও গোপাল অরবিন্দের প্রিয় দৃশ্য ছিল। সে দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার আনন্দের আর অবধি থাকিত না।

মানুষের প্রতি এবং জগতের পশু-পক্ষী বৃক্ষলতার প্রতি যে কতখানি আকর্ষণ আসক্তি ও ভালবাসা আছে, তাহা নির্জনবাস না করিলে তেমন উপলব্ধি করা যায় না। অরবিন্দও যতদিন নির্জন নিঃসঙ্গ জীবনকে গ্রহণ করিতে বাধ্য হন নাই, ততদিন মানুষ, পশুপক্ষী ও বৃক্ষলতার প্রতি তিনি তেমন আকর্ষণ বোধ করেন নাই। কিন্তু জেলের মধ্যে বসিয়া বসিয়া তিনি জগতের চেতন-অচেতন সকল পদার্থকে ভালবাসিতে শিখিলেন। গরু পাখী পিপীলিকা প্রভৃতি পর্য্যন্ত দেখিয়া অরবিন্দের মন এই সময়ে আনন্দে বিস্ময়ে অধীর হইয়া উঠিত।

————

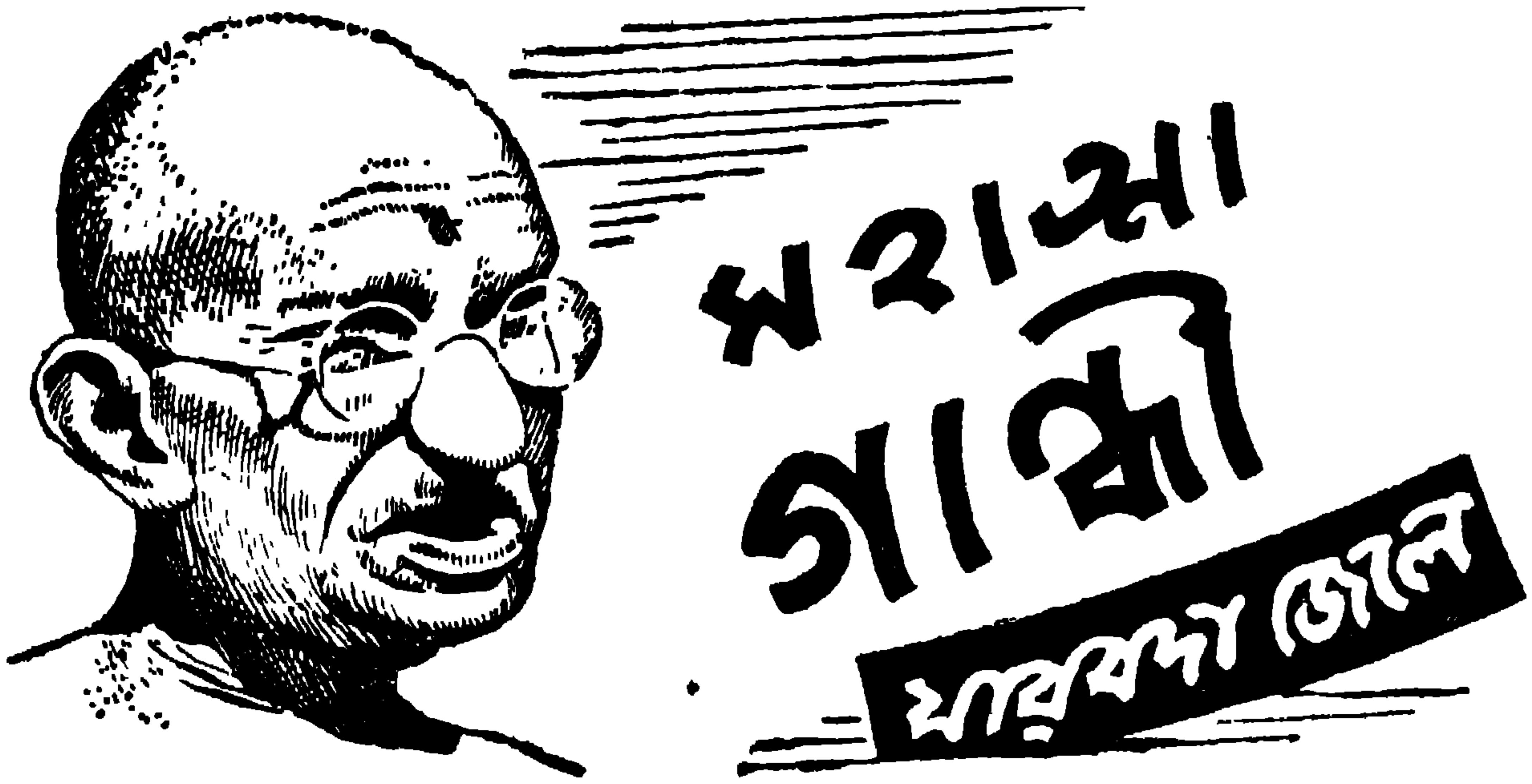

১৯২২ সালের ১০ই মার্চ্চ। সেদিনকার রাত্রিটি বড় সুন্দর। সত্যাগ্রহ আশ্রমের সকলকে শুইতে বলিয়া মহাত্মা গান্ধীও নিদ্রার জন্য তৈরী হইতেছিলেন। এমন সময়ে তিনি খবর পাইলেন যে, পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ হিলি সাহেব তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ওয়ারেণ্ট লইয়া আশ্রমের বাহিরে মোটরে অপেক্ষা করিতেছেন!

গ্রেপ্তার হওয়ার অভিজ্ঞতা গান্ধীজীর এই প্রথম নহে। তিনি তখন পুরাতন অপরাধী—ইংরাজ সরকারের চোখে দেশকে ভালবাসা তাঁহার অপরাধ, দেশের সাধারণ লোকদের মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তাহাদিগকে সত্যাগ্রহ সংগ্রামে

মাতাইয়া তোলা তাঁহার অপরাধ! এই অপরাধে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় বন্দী হইয়াছেন বারংবার। সেখানে দুর্দান্ত কয়েদী মনে করিয়া সরকার তাঁহাকে এক জেলে বেশী দিন রাখিতেন না—এক জেল হইতে অন্য জেলে সরকার তাঁহাকে ক্রমাগত ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেন।

১৯২২ সালের আগে ভারতেও তাঁহার জেল-জীবনের অভিজ্ঞতা হইয়াছে। সুতরাং গ্রেপ্তার বা জেল-জীবনের অভিজ্ঞতা গান্ধীজীর জীবনে নূতন নহে। বিশেষত এই সময়ে (১৯২২) তিনি সত্যাগ্রহ সংগ্রামে বিশেষভাবে নেতৃত্ব করিতেছিলেন। তিনি একরকম জানিতেনই যে, যে-কোনদিন সরকার তাঁহাকে গ্রেপ্তারের আদেশ জারি করিবেন।

সেইজন্য গ্রেপ্তারের আদেশ গান্ধীজী যখন শুনিলেন, তখন এটুটুকু বিস্মিত বা বিচলিত তিনি হইলেন না। প্রতি-বারেই তিনি যখন জেলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেন, তখন মনে হইত যেন তিনি কোন উৎসবে যোগ দিতে যাইবার জন্য তৈয়ারী হইতেছেন। এবারেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। তিনি দুইখানা কচ্ছ, দুইখানা কম্বল ও পাঁচখানা বই লইয়া পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সহিত প্রফুল্লমনেই যাত্রা করিলেন। বই পাঁচখানার মধ্যে ছিল একখানা ভগবদ্‌গীতা, আশ্রম-ভজনাবলী, রামায়ণ ও কোরাণের ইংরাজি অনুবাদ।

রুদ্ধকারার অন্তরালে

বন্দী গান্ধীজীর বিচার হইয়া গেল এবং বিচারে তাঁহার ছয় বৎসরের কারাদণ্ড হইল। তিনি প্রথমে সবরমতীর জেলে অন্তরীন হইলেন। কিন্তু দুইদিন পরেই রাত্রির অন্ধকারে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ তাঁহাকে সবরমতী ষ্টেশনে একটি স্পেশাল ট্রেণে উঠাইলেন। পথে খাইবার জন্য তাঁহাকে এক ঝুড়ি ফল দেওয়া হয় এবং সারা পথ তাঁহার বেশ যত্নই করা হইল। যে ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ গান্ধীজীকে সঙ্গে লইয়া যাইতেছিলেন তিনি পথে গান্ধীজীর জন্য ছাগলের ও গরুর দুধের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

কিন্তু কিরকী ষ্টেশানে গাড়ী যখন পৌঁছিল—তখন হইতে গান্ধীজী অনুভব করিতে লাগিলেন যে তিনি কয়েদী। সেখানে নামাইয়া তাঁহাকে একটা কয়েদীর মোটর ভ্যানে পোরা হইল। গাড়ীখানিতে হাওয়া প্রবেশের জন্য পাশে ছিদ্র ছিল। প্রাণে না মারিয়া কয়েদীকে আধমরা করিবার জন্য সভ্য জগতের অপরূপ কৌশল! এই গাড়ীখানার সম্বন্ধে গান্ধীজী নিজেই বলিয়াছেন—"ঐ গাড়ীখানাকে যদি কদাকার নাও বলা যায়, তবে অন্ততঃ উহাকে পরদামোটর বলা যাইতে পারে, কেননা উহার ভিতর হইতে বাহিরের কিছুই দেখার যো ছিল না।" এই গাড়ীতে করিয়া কয়েদীকে বাহিরের জগতের দৃশ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া—কোথায় কোন্ পথে তাহাকে লইয়া যাওয়া হইতেছে তাহা জানিতে না দিয়া—প্রাণে না মারিয়া, এক জেল

হইতে অন্য জেলে, অথবা এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় লইয়া যাওয়া হয়। গান্ধীজীকেও ঐ গাড়ীতে করিয়া লইয়া যাওয়া হইল। কোথায় তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হইতেছিল তাহা তিনি প্রথমে জানিতেন না। পৌঁছিয়া বুঝিতে পারিলেন—সেটা যারবদা জেল। ইতিপূর্ব্বে তিনি এই জেলখানা সম্বন্ধে ভাল অভিমত শুনেন নাই। সুতরাং এখানে পৌঁছিয়া তাঁহার মনটা খারাপ হইয়া গেল।

কারাগারের দরজায় পৌঁছিলে কারাগারের অধ্যক্ষ বলিলেন যে, তাঁহার সঙ্গে যে চরকা আছে ও খাইবার জন্য ফল আছে তাহা তিনি কারাগারের মধ্যে লইতে পারিবেন না। উত্তরে গান্ধীজী বলিলেন, "সূতা কাটা আমার ব্রত এবং সবরমতীর জেলে আমাকে সূতা কাটিতে দেওয়া হইত।" উত্তরে কারাগারের অধ্যক্ষ বলিলেন, "যারবদা সবরমতী নহে।" এই উত্তরে গান্ধীজী ক্ষুণ্ণ হইলেন। কিন্তু কি করিবেন—তিনি কয়েদী। নীরবে ক্ষুণ্ণমনে তাঁহার প্রাণের চেয়েও প্রিয় চরকা-টিকে বাহিরে ফেলিয়াই কারাগারের মধ্যে তিনি প্রবেশ করিলেন। কারাগারের লৌহদ্বার ঝন্ ঝন্ শব্দে বন্ধ হইয়া গেল।

পরদিন সকালবেলা কারাগারের অধ্যক্ষ মহাশয় গান্ধীজীর সহিত দেখা করিতে আসিলেন, এবং আগের দিন রাত্রিতে তিনি কেমন কাটাইয়াছেন তাহা জানিতে চাহিলেন। তাঁহার

সহিত কথা বলিয়া গান্ধীজী এবার বুঝিলেন যে পূর্ব্বদিবস এই লোকটিকে যত নির্দয় বলিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন, বাস্তবিক্‌পক্ষে উনি ততটা নির্দয় নহেন। বিশেষতঃ গান্ধীজীর সঙ্গে কথা বলিয়া যখন ইনি বুঝিলেন যে চরকা রাখাটা তাঁহার অত্যাবশ্যক, তখন কারাগারের বাহিরে পরিত্যক্ত গান্ধী-জীর চরকা গান্ধীজীকে ফিরাইয়া দিবার আদেশ তিনি দান করিলেন।

নিঃসঙ্গ কারাজীবনে পড়িবার জন্য গান্ধীজী তাঁহার সঙ্গে সাতখানি মাত্র বই আনিয়াছিলেন। উহার মধ্যে পাঁচখানিই ছিল ধর্মবিষয়ক বই, একখানি অভিধান, আর একখানি মৌলানা আবুল কালাম আজাদের দেওয়া উর্দু শিক্ষার বই। রাজনীতি-বিষয়ক বই তাঁহার সঙ্গে একখানিও ছিল না। কিন্তু তবু ইহাতে কারা-কর্তৃপক্ষের কম আপত্তি উঠে নাই। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্‌ প্রথমটায় বলিলেন যে, তাঁহার উপর কড়া হুকুম আছে, জেলের লাইব্রেরীর বই ছাড়া অন্য কোন বই যেন কয়েদীদিগকে দেওয়া না হয়। সুতরাং গান্ধীজীকে তিনি অনুরোধ করিলেন, “আপনি আপনার বইগুলি জেলের লাইব্রেরীতে প্রথমে দান করুন, পরে জেল-লাইব্রেরী হইতে ওগুলি আনিয়া পড়ুন।” কিন্তু যে সকল বই গান্ধীজীর নিত্যসহচর, অথবা যে সব বই তিনি তাঁহার প্রিয় বন্ধুদের কাছ হইতে পাইয়াছেন, সেগুলিকে স্বত্ব-ত্যাগ করিয়া

লাইব্রেরীতে দান করা যে কত বেদনাদায়ক গান্ধীজী সেকথা জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্‌কে অনেক কষ্টে বুঝাইলেন। শেষ পর্যন্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্‌ গান্ধীজীর কথাই রাখিলেন। গান্ধীজীকে তিনি ঐ বইগুলি রাখিতে দিলেন, সেগুলি পড়িবার অধিকার তাঁহাকে দান করিলেন।

কারাগারে গান্ধীজী খুব বই পড়িতেন। সঙ্গে যে কয়খানি বই তিনি আনিয়াছিলেন তাহা ত তাঁহার নিত্যকার পাঠ্য ছিলই। এ ছাড়া লাইব্রেরী হইতে বই আনাইয়া বই পড়ার বিরাম তাঁহার ছিল না। কারাগারের বাহিরে যখন তিনি থাকিতেন, তখন হয় রাজনীতির আবর্তে পড়িয়া, নয় ত সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনার জন্য তিনি পড়িবার অবসর আদৌ পাইতেন না। কিন্তু নির্জন নিঃসঙ্গ কারাবাসে পড়িবার অবকাশ যথেষ্ট পাইতেন। সেইজন্য সময়ের পূর্বে যদি কখনও কোন কারণে তাঁহাকে জেল হইতে মুক্ত করা হইত, তবে পড়ার অবসরটুকু হারাইলেন ভাবিয়া তাঁহার মন ব্যথিত হইয়া উঠিত।

ছেলেবেলায় ইস্কুলপাঠ্য বই ছাড়া আর কিছু পড়িতে তাঁহার ভাল লাগিত না। ইংলণ্ডে যখন তিনি গিয়াছিলেন, তখনও পাঠ্য বই ছাড়া অন্য কিছু না পড়ার অভ্যাসটাই তাঁহার মধ্যে জন্মিয়াছিল। কিন্তু জীবনযাত্রা আরম্ভ করিয়া তিনি বুঝিতে পারেন যে, জ্ঞান বাড়াইবার জন্য পড়ার অভ্যাস রাখা বিশেষ দরকার। তবে জীবনের ঝড়-ঝঞ্ঝায় পড়ার অবসর

তাঁহার বড় একটা মিলিত না। একটানা পড়ার অবসর যাহা পাইয়াছিলেন, তাহা জেলেই তিনি পান। যারবদা জেলে তিনি প্রচুর অবসর পাইলেন। কেহ তাঁহাকে বিরক্ত করিতে আসে না। সেখানে সত্যাগ্রহ সংগ্রাম নাই, দর্শনপ্রার্থীর ভিড় নাই। সুতরাং গান্ধীজী পড়ায় মন দিলেন। তাঁহার বয়স তখন চুয়ান্ন। কিন্তু চুয়ান্ন বছরের বৃদ্ধ চব্বিশ বছরের যুবার মত পড়িতে সুরু করিলেন।

সেবারে পাঁচ বছরের জন্য তাঁহার কারাদণ্ড হইয়াছিল। সুতরাং তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, ঐ পাঁচ বৎসরে তিনি অনেক বিষয় পড়িয়া জ্ঞান লাভ করিবেন। কিন্তু মানুষ ভাবে এক এবং হয় আর। তাঁহার অসুস্থতার জন্য ইংরেজ সরকার তাঁহাকে দুই বছর বাদেই মুক্তিদান করেন। ইহাতে গান্ধীজী মনে মনে দুঃখ পাইয়াছিলেন।

যারবদা জেলে মহাত্মা গান্ধীকে বলা হইয়াছিল যে, তিনি তাঁহার নিজের খরচে সাময়িক পত্রিকাদি আনাইতে পারেন। কিন্তু সংবাদপত্র তাঁহাকে পাঠ করিতে দেওয়া হইত না। তিনি একবার 'টাইমস অব ইণ্ডিয়া' পত্রিকাখানি চাহিয়াছিলেন। কিন্তু উহাতেও রাজনৈতিক আলোচনা থাকে বলিয়া সেখানি তাঁহাকে দেওয়া হয় নাই।

রুটি কাটার জন্য এবং লেবু কাটার জন্য গান্ধীজীর একখানি ছুরির বড় দরকার হইয়াছিল। কিন্তু কয়েদীদিগকে ছুরি

দেওয়া হইত না বলিয়া, গান্ধীজীর বেলাতেও তাঁহাকে একখানি ছুরি দিতে কারাকর্তৃপক্ষের নিদারুণ আপত্তি উঠিয়াছিল। শেষ-কালে গান্ধীজী যখন বলিলেন যে, হয় তাঁহাকে ছুরি দেওয়া হউক, নয় ত তাঁহার রুটি ও লেবু খাওয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক—তখন জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ বলিলেন—"আচ্ছা আপনি আপনার কলম কাটা ছুরিখানি রুটি কাটার জন্য বা লেবু কাটার জন্য ব্যবহার করিতে পারেন।"

কারাগারে প্রবেশ করার সময়ে ছুরিখানি জেল অফিসে জমা রাখিয়া আসিতে হইয়াছিল। যখন ছুরি ব্যবহার মঞ্জুর হইল, তখন ছুরিখানি আসিল। কিন্তু গান্ধীজী উহা রাখিতে পাইলেন না। একজন কয়েদী ওয়ার্ডার গান্ধীজীর তদারক করিত। তাহার কাছে সেই ছোট ছুরিখানি রহিল। বলা হইল, তাঁহার যখন দরকার হইবে, তখন উহা তিনি সেই ওয়ার্ডারের কাছ হইতে লইবেন। কাজ হইয়া গেলেই ওয়ার্ডারের কাছে ছুরিখানি তাঁহাকে ফেরত দিতে হইবে। কি জানি ঐ ছুরি দিয়া গান্ধীজী যদি খুন-জখম করিয়া বসেন, এই আশঙ্কা আর কি!

গান্ধীজী অগত্যা এই ব্যবস্থা মানিয়া লইয়াছিলেন।

জেলে দুইজন কয়েদী গান্ধীজীর খবরদারী করিত। একজন দিনে, অপর জন রাত্রিতে। ইহারাই কয়েদী ওয়ার্ডার। যে সকল কয়েদীর দীর্ঘ দিনের মেয়াদ, তাহারা কারাগারের মধ্যে

ভালভাবে থাকিলে উহাদিগকে অন্য সব কয়েদীদের খবরদারীর কাজে লাগান হয়। তখন তাহারা অন্য কয়েদীদের উপর বেশ মাতব্বরী করিয়া থাকে।

প্রথমে যে তুইজন কয়েদী গান্ধীজীর খবরদারী করিত তাহারা তুইজনেই খুনের দায়ে কারাগারে আসিয়াছিল। এক-জনের নাম হরকরণ—পাঞ্জাবী হিন্দু। সে দিনের বেলায় গান্ধীজীর কাছে থাকিত। অপরজন সাবাস খাঁ—বেলুচী মুসলমান। সে রাত্রিতে গান্ধীজীর পাহারায় থাকিত।

হরকরণের চৌদ্দ বৎসরের জেল হইয়াছিল। তাহার মধ্যে নয় বৎসর কারাবাস করিয়া সে মুক্তির জন্য উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল এবং দীর্ঘকাল কারাবাসের ফলে লোকটা ভয়ানক খিটখিটে হইয়া গিয়াছিল। যে সকল কয়েদী তাহার কথা শুনিত, তাহাদের উপরে সে মাতব্বরী করিত। আর যাহারা তাহার বিরুদ্ধতা করিত, তাহাদের উপর সে গুণ্ডামী করিত। লোকটা চোরও ছিল—শুধু এই হরকরণ নয়, জেলের মধ্যে বহু কয়েদীই ফাঁক পাইলে যে চুরি করে গান্ধীজী ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। হরকরণ এবং অন্যান্য বহু কয়েদীই জেলখানার মধ্যে একটু চুরি করা মোটেই অন্যায় বলিয়া মনে করিত না। গান্ধীজী দেখিলেন যে যাহারা চুরি করে না, তাহাদিগকে কয়েদীরা বোকা মনে করে। তাহাকে উহারা একঘরে ত করেই—নানারকম নির্যাতনও তাহার উপর সেই সঙ্গে

চলিয়া থাকে। সমস্ত জেলখানার ভিতরকার অবস্থাটা এমনই দূষিত যে, তাহা দেখিয়া জেলখানা সংস্কার করার বাসনা গান্ধীজীর মনে জাগিয়াছিল। যদি জেলের সমগ্র মাটিটা দেড় হাত পরিমাণ খুঁড়িয়া ফেলা হয়, ত বসুন্ধরা কয়েদীদের অনেক গুপ্ত কাহিনী প্রকাশ করিয়া দিবেন। অনেক চামচ, ছুরি, বাসন, সাবান ইত্যাদি মাটির নীচ হইতে বাহির হইয়া পড়িবে।

হরকরণ একজন পুরাণো কয়েদী বলিয়া, সে অন্য কয়েদীদের মাল জোগানদার ছিল। যাহার যখন কিছু দরকার হইত, হরকরণ তাহা জোগাইত। গান্ধীজীর লেবু ও রুটি কাটার জন্য ছুরির দরকার হইয়াছিল। হরকরণের কাছ হইতে চাহিলে হরকরণ তাহা গান্ধীজীকে নিশ্চয় দিতে পারিত। কিন্তু গান্ধীজী জীবনে সবসময়ে সোজা পথে চলিতেন, অন্যায়, অসত্য ও অধর্ম্মের পথে চলা তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। তাই হরকরণের ছুরি জোগানের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও গান্ধীজী তাহার শরণাপন্ন হন নাই। তিনি সরাসরি জেল-কর্ত্তৃপক্ষের কাছেই আবেদন করিয়াছিলেন।

গান্ধীজীর কাছে হরকরণ মাঝে মাঝেই তাহার আশ্চর্য কাণ্ডকারখানার গল্প করিত। কেমন করিয়া সে জেল-কর্ত্তৃ-পক্ষদের চোখে ধূলা দিত, কেমন করিয়া ভাল খাবার জোগাড় করিত—এমনি সব গল্প মহা উৎসাহের সহিত গান্ধীজীকে

সে শুনাইত। গান্ধীজীকেও সে তাহাদের দলে টানিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু তাহার ঐ সকল কৌশলে গান্ধীজীর কোন কৌতূহল নাই জানিয়া এবং তিনি তাহাদের দলে যোগ দিতে চাহেন না বুঝিয়া, সে একদিন যেন আকাশ হইতে পড়িল। গান্ধীজীর সাধুতার পরিচয় পাইয়া সে অনুতপ্ত হইয়াছিল এবং ভবিষ্যতে আর ঐ ধরণের কাজ করিবে না—একথা গান্ধীজীকে বলিয়াছিল।

ইহার পরেই হরকরণ বুঝিয়াছিল যে, গান্ধীজী তাহাদের মত সাধারণ কয়েদী নহেন—তিনি রাজনৈতিক কয়েদী। এই কথা বুঝার সঙ্গে সঙ্গে সে গান্ধীজীর সেবায় উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল। গান্ধীজীকে সে আদুরে শিশুতে পরিণত করিল। কোন কিছুই সে তাঁহাকে করিতে দেয় না। গান্ধীজী নিজেই নিজের ঘর ঝাঁট দিতেন। কিন্তু হঠাৎ হরকরণ গান্ধীজী যে কত বড় তাহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে ঘর ঝাঁট দিতে দিত না। কম্বলটাও তুলিয়া শুকাইতে দিতে গেলে, সে গান্ধীজীর হাত হইতে তাহা কাড়িয়া লইত। গান্ধীজীর কিছুই করিবার উপায় নাই। গামছাটা কাচিতেও তিনি পারিতেন না। যদি হরকরণ কাচার শব্দ শুনিত, তবে তখনই স্নানের ঘরে ঢুকিয়া তাঁহার হাত হইতে উহা কড়িয়া লইত। গান্ধীজীর প্রতি হরকরণের এই রকম ভক্তি দেখিয়া জেল-কর্তৃপক্ষের কি যেন মনে হইল। তাঁহারা তাহাকে জেলের অন্যত্র বদলী করিলেন। ইহাতে

গান্ধীজী ত ব্যথিত হইয়াছিলেনই, তাঁহার চেয়ে বেশী ব্যথিত হইয়াছিল হরকরণ।

এই হরকরণ ছাড়া, সাবাস খাঁ প্রভৃতি আরও কয়েকজন কয়েদী ওয়ার্ডারের সহিত গান্ধীজীর বিশেষ সৌহার্দ্য হইয়াছিল এবং যখনই উহাদিগকে বদলী করা হইত তখন উহারা যেমন ব্যথিত হইত, গান্ধীজীও সেইরূপ ব্যথিত হইতেন।

যে সকল কয়েদী ওয়ার্ডার গান্ধীজীর সংস্পর্শে আসিয়াছিল তাহাদের মধ্যে একজন ছিল অস্পৃশ্য। সে বহু ইতস্ততঃ করিয়া গান্ধীজীর কুঠরীতে ঢুকিত। সে তাঁহার বাসন ছুঁইত না। কিন্তু গান্ধীজী তাহাকে একথা বলিয়া আশ্বস্ত করিয়াছিলেন যে, অস্পৃশ্যতা তিনি মানেন না এবং উহা দূর করার ব্রত তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। তখন তাহার সঙ্কোচ অনেকটা কমিয়া যায় এবং কালক্রমে সে গান্ধীজীর এত অনুগত হইল যে, বিদায়ের দিনে সে গান্ধীজীর কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, বাহিরে গিয়া খদ্দর ছাড়া সে আর কিছুই পরিবে না। কয়েকজন কয়েদী ওয়ার্ডার আবার গান্ধীজীর দেখাদেখি চরখায় সূতা কাটিতেও শিখিয়া গিয়াছিল। একজন ত গান্ধীজীর চেয়ে ভাল এবং মিহি সূতা কাটিত। কারাগারের মধ্যেও গান্ধীজী চরখা ও খদ্দর ব্যবহারের প্রচার নিজ দৃষ্টান্তের দ্বারাই করিয়াছিলেন।

কারাগারে গান্ধীজী যেখানে থাকিতেন সেখানকার এক-পাশে একটা কাঁটা তারের বেড়া, তাহার পরেই একটা বড়

খোলা জায়গা। কিন্তু সেখানে একটা খড়ির দাগ টানা ছিল। তাহার ওপারে তাঁহার যাইবার অধিকার ছিল না। ইহা যেন বালক রবীন্দ্রনাথের চারি পাশের খড়ির গণ্ডীর মত গান্ধীজীর সম্মুখে নিষেধের প্রাচীর। রবীন্দ্রনাথ খড়ির গণ্ডী পার হইবার জন্য ব্যাকুল হইতেন। গান্ধীজীও ঐ খড়ির গণ্ডী পার হইবার জন্য একবার আবেদন করিয়াছিলেন। তাঁহার সে আবেদন মঞ্জুর হইয়াছিল। ইহাতে তিনি বেড়াইবার জন্য ও ব্যায়াম করার জন্য অনেকখানি জায়গা পাইয়াছিলেন।

কারাগারে গান্ধীজী ছিলেন নিঃসঙ্গ কয়েদী। অন্য কোন কয়েদীর সহিত কথা বলার অধিকার তাঁহার ছিল না। গান্ধীজী একলা থাকিতে ভালবাসিতেন। সুতরাং নিঃসঙ্গ জীবনে তিনি পীড়িত হন নাই। নীরবতা তাঁহাকে আনন্দই দিত। এই নিঃসঙ্গতায় তাঁহার পড়াশুনা বেশ ভালই হইত।

যে কুঠরীতে তিনি থাকিতেন, সেটা বেশ সুন্দর ও পরিষ্কার ছিল। বাতাস সেই ঘরে অবাধে চলাচল করিত। গান্ধীজী বাহিরে শুইতে অভ্যস্ত ছিলেন। কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে বাহিরে শুইতে দিয়া তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশই করিয়াছিলেন।

প্রত্যহ তিনি ভোর চারটায় ঘুম হইতে উঠিতেন। তারপর ভগবানের স্তোত্র ও ভজন আবৃত্তি করিতেন। ভোর সাড়ে ছয়টায় তিনি পড়িতে আরম্ভ করিতেন। জেলে তাঁহাকে আলো

দেওয়া হইত না। সেই জন্য দিনের আলো ফুটিলে তিনি পড়িতে সুরু করিতেন, তারপর রাত্রি সাতটা পর্য্যন্ত পড়াশুনা তিনি করিতেন। কারণ রাত্রি ৭টার পর বাতি না হইলে পড়াশুনা করা সম্ভব নয়।

কারাগারে পড়াশুনা ছাড়া সারা দিনের মধ্যে গান্ধীজীর কাজ ছিল সূতা কাটা, তূলা ধোনা। বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের সহিত পত্রালাপ করার অধিকার গান্ধীজীর ছিল। কিন্তু কয়েকবার তিনি তাঁহার কারাকাহিনী বর্ণনা করিয়া যে পত্র লিখেন, তাহা পাঠান হয় নাই এবং তাঁহার পত্রের বিষয় সম্বন্ধে একটা বিধিনিষেধ আরোপিত হয়। ইহাতে তিনি পত্রালাপ বন্ধ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন এবং গবর্ণরের নিকটে তাঁহার প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন। স্বাধীনতার উপর কোন প্রকার বিধিনিষেধ বরদাস্ত করার পাত্র মহাত্মা গান্ধী ছিলেন না।

গান্ধীজী তাঁহার কারাবাসকালে জেলখানার ভিতরকার দুর্ব্যবহার প্রভৃতির প্রতি উদাসীন ছিলেন না। যেখানে অন্যায় অথবা উৎপীড়ন হইত, সেখানেই তাঁহার অন্তর বিদ্রোহী হইয়া উঠিত। অন্যায়ের প্রতিকার করার জন্য তিনি ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেন। কিন্তু কয়েদী বলিয়া তিনি সবসময় সকল ব্যাপারের প্রতিকার করিতে পারিতেন না। এজন্য তাঁহার অন্তর ব্যথাতুর হইয়া উঠিত।

কয়েকবার জেলের কয়েকজন কয়েদী তাহাদের কর্তব্যকার্য ঠিকভাবে করে নাই। এ জন্য তাহাদিগকে বেত্রাঘাত করা হয়। উহাদের কাতর চীৎকার মহাত্মাজীর কানে আসে। এ ব্যাপারে গান্ধীজী মনে অত্যন্ত কষ্ট পান এবং জেলের কয়েদীদিগকে ঐ রকম করিয়া নির্মম শাস্তি দিয়া না শোধরাইয়া, তাহাদিগের সহিত মিশিয়া তাহাদিগকে জেলের নিয়মানুবর্তিতা শিখাইবার জন্য তিনি জেল-কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন। কিন্তু তাঁহার সে অনুরোধ রাখা হয় নাই।

জেলের ব্যবস্থায় নানারকম গলদ আর কয়েদীদের উপর নানারকম অমানুষিক অত্যাচার অবিচার লক্ষ্য করিয়া এই যারবদা জেলে গান্ধীজীর এক নূতন অভিজ্ঞতা হইয়াছিল এবং সেজন্য তিনি জেলের সংস্কার করিতে চাহিয়াছিলেন।

গান্ধীজী লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, এদেশে কয়েদীদের একবার জেলে পুরিয়া দিবার পর, তাহাদের যে কি হইল সে খবর রাখা শাসনকর্তারা তাঁহাদের কর্তব্যের মধ্যে গণ্য করেন না। অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া হয় তাহাদের সংশোধনের জন্য। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে দেখা যায় যে, শাস্তি ভোগ করিয়া কয়েদীদের পশুত্ব বাড়িয়াই থাকে। লোক-দেখান একজন ধর্মোপদেষ্টা সপ্তাহে একবার করিয়া জেলখানায় দেখা দিয়া যাইতেন বটে—কিন্তু তাহাতে ফল কিছুই হইত না। কয়েদীদিগকে সৎপথে চালিত করিতে হইলে, তাহাদিগকে শোধরাইতে হইলে,

সমস্ত জেলখানার আবেষ্টনটি ভাল করা প্রয়োজন। কিন্তু গান্ধীজী দেখিলেন জেলখানায় এমন সব অসাধু ব্যবস্থা প্রচলিত, যাহার বদল না হইলে জেলখানার আবহাওয়া ভাল হইবার নহে।

জেলখানায় রান্না করার কাজ সমস্ত কয়েদীদের উপর। অন্যান্য সকল কাজও—যেমন ধান ভানা, তরকারী উৎপাদন করা, রান্না পরিবেশন করা—এ সবই কয়েদীরা করিয়া থাকে। তবু মাপের চেয়ে কম খাবার পরিবেশন করা হইয়াছে—এমন অভিযোগ গান্ধীজী প্রায়ই শুনিতে পাইতেন। কাঁচা খাদ্য দেওয়ার অভিযোগ এবং রান্না খারাপ হওয়ার কথাও গান্ধীজী প্রায়ই শুনিতেন। কর্তৃপক্ষের কাছে এ সকল বিষয়ের অভিযোগ করিলে তাঁহারা সাধারণতঃ বলিতেন, "তোমাদের খাবার ত তোমরাই রান্না করিতেছ। ভাল করিলে তোমরাই করিতে পার।" যেন কয়েদীরা পরস্পর বন্ধু এবং তাহারা সকলেই নিজ নিজ দায়িত্ব বুঝে। গান্ধীজী কয়েদীদের মধ্যে এই বন্ধুভাব জন্মাইয়া তাহাদিগের মধ্যে দায়িত্ববোধ জাগাইতে চাহিয়াছিলেন। জেলখানায় কয়েদীরা যে কাজ করে, তাহা যে কয়েদীদের নিজেদের কাজ, সে সকল কাজ ভালরূপে হইলে যে তাহাদেরই সুবিধা, একথা তিনি কয়েদীদিগকে বুঝাইবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন। কিন্তু সে সুযোগ তিনি পান নাই। বন্দী গান্ধীজীর কথায় আমলাতন্ত্রী সরকার কান্ দিবেন কেন?

———

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন একবার তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, "সমস্ত ভারতবর্ষই এক বৃহৎ কারাগার।" তখন দেশের শাসনভার ছিল ইংরেজের হাতে, তাহারাই ছিল ভারতের হর্তা, কর্তা, বিধাতা। দেশের লোককে তাহাদের আদেশেই উঠিতে বসিতে চলিতে ফিরিতে হইত; তাহাদের শত নিপীড়ন নীরবে সহ্য করিতে হইত। হাজার অন্যায় করিলেও ইংরেজের বিরুদ্ধে কিছুই বলিবার যো ছিল না। কারণ, তাহারা যে প্রভু,—রাজার জাত! নিজের ইচ্ছামত যেখানে চলাফেরা করা যায় না উহাই ত' কারাগার। দেশবাসীর এই পরাধীনতাকে লক্ষ্য করিয়াই দেশবন্ধু ঐরূপ কথা বলিয়াছিলেন।

উপরে যে কারাগারের কথা বলা হইয়াছে উহা চোখে দেখা যায় না, মনে অনুভব করা যায়। কিন্তু চোখে দেখা

যায় এমন বহু কারাগারও ইংরেজ-রাজত্বে ছিল। ঐ কারাগারের চারিদিকে খুব উঁচু দেওয়াল, ভিতরে ছোট ছোট ঘর, তাহাতে না আছে জানালা, না আছে একটার বেশি দুইটা দরজা। সূর্যের আলো প্রবেশ করে না সেই সব ঘরে, বাতাস পর্যন্ত কঠিন প্রাচীরে আঘাত খাইয়া ফিরিয়া যায়। চারিদিকে কেবল লোহার বন্ধন। লোহার শিক, লোহার গরাদে, লোহার শিকল। ইহার উপর বাহিরে বন্দুক-কাঁধে সিপাই-শান্ত্রী ত' আছেই। এইখানেই বন্দীদের থাকিতে হয়। কেবল চোর-ডাকাত নয়, ইংরেজের বিরুদ্ধে যে কিছু বলিয়াছে, যে কিছু করিয়াছে, তাহাকেই এই বিচিত্র কারাগারে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে। কত দেশপ্রেমিক বীর কর্মী যে ইংরেজের এই কারাগারে কত অসহ্য অত্যাচার সহ্য করিয়াছেন, কত কষ্টে বন্দী-জীবনের দিনগুলি কাটাইয়াছেন তাহার সীমাসংখ্যা নাই। তাঁহাদের অনেকেই জেল-জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা পুস্তকে লিখিয়া রাখিয়াছেন। ঐ সকল পুস্তক পড়িয়া জেলের ভিতরকার কথা আমরা অনেক কিছু জানিতে পারি। বর্তমানে যিনি স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী সেই পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকেও দেশপ্রেমের অপরাধে বহুবার জেলে যাইতে হইয়াছিল। উঁহারই দুই-একটি কাহিনী আজ বলিব।

ইংরেজি ১৯৩০ সালে। লবণ আইন ভঙ্গ করিবার জন্য মহাত্মা গান্ধী সবরমতী আশ্রম হইতে ডাণ্ডীর দিকে যাত্রা

করিয়াছেন। দেশের চারিদিকে কী উৎসাহ, কী উত্তেজনা! লবণ আইন ভঙ্গ করিতে হইবে,—সকলের মনে এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। সকলের মুখে লবণের কথা। সকলের ভাব এই যে, ইংরেজের আইন আর আমরা মানিব না, লবণকরকে অবহেলা করিয়াই তাহার প্রথম পরীক্ষা দিব। দলে দলে লোক চলিয়াছে সমুদ্রের দিকে। মনে হইতেছে যেন বাঁধ ভাঙ্গিয়া হঠাৎ বিপুল বন্যা আসিয়াছে। এই বন্যাকে কে রোধ করিবে?

এদিকে ইংরেজও বসিয়া নাই। তাহারাও ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। কী,—এত বড় স্পর্ধা এই কালা আদমিদের? মনিবকে তাহারা মানে না? স্বাধীন হইতে চায়? মারিয়া উহাদের শায়েস্তা করিতে হইবে। অমনি চারিদিকে ধরপাকড় সুরু হইল। পুলিশের লাঠিও চলিল। কতজনের মাথা ফাটিল, কতজনের হাত-পা ভাঙিল, দেশবাসীর রক্তে দেশের মাটি ভিজিয়া গেল। তবুও কি দেশের লোকেরা হার মানে? তাহারা যে মরণ পণ করিয়া বসিয়াছে,—দেখি, ইংরেজ কত অত্যাচার করিতে পারে! মরিতে মরিতেও তাহারা বলে, বন্দে মাতরম্।

৬ই এপ্রিল তারিখে গান্ধীজী ডাণ্ডীতে লবণ আইন ভঙ্গ করিলেন। ১৪ই এপ্রিল জওহরলালকে গ্রেফ্‌তার করা হইল। সেই দিনই হইল তাঁহার বিচার। বিচারে কারাদণ্ডের আদেশ হইল ছয় মাসের জন্য। জওহরলাল প্রবেশ করিলেন নৈনী সেনট্রাল জেলে।

নৈনী জেল একটি বেশ বড় কারাগার। সেই কারাগারের এক কোণে স্থান হইল পণ্ডিতজীর। যেখানে তাঁহাকে রাখা হইয়াছিল সেখানে ছিল চারিটি সেল। সেলগুলি যেমন ছোট তেমনই বিশ্রী। উহারই দুইটি সেল দেওয়া হইল জওহরলালকে। একটিতে থাকিবার এবং অপরটিতে স্নান করিবার ব্যবস্থা। আর-দুইটি সেল তখন খালি।

তখন গ্রীষ্মকাল। সেলের ভিতরে বড় গরম। সেলের বাহিরে দেওয়াল ও দালানের মাঝখানে একটুখানি জায়গা ছিল, জওহরলালকে সেখানে থাকিবার অনুমতি দেওয়া হইল। তাঁহার খাটের সঙ্গে খুব শক্ত শিকল বাঁধিয়া দেওয়া হইল, যাহাতে খাটটিকে মই করিয়া দেওয়াল টপকাইয়া তিনি না পলাইয়া যান! সেই অপরূপ জায়গায় বিচিত্র বিছানায় শুইয়া সারা রাত ধরিয়া তিনি শুনিতেন, কারা-প্রহরীরা পাহারা দিতে দিতে মাঝে মাঝে চীৎকার করিয়া উঠিতেছে, জেলের কয়েদী-মেট্‌গুলি জোর গলায় কয়েদীদের সংখ্যা গুণিতেছে এবং আরও জোরে তাহা উপরওয়ালাদিগকে হাঁক মারিয়া জানাইয়া দিতেছে। ইহাতে মানুষের ঘুম যে কেমন হইতে পারে তাহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু কারাগার ত' নিশ্চিন্তে ঘুমাইবার জায়গা নয়? শরীর ও মন—দুইয়ের উপর নির্যাতন করাই উহার উদ্দেশ্য।

চারিদিকে দেওয়ালের বেড়া,—জওহরলালের মন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। ভিতর হইতে আকাশটুকু পর্যন্ত দেখিবার উপায় নাই,

মন যেন আরও ঝিমাইয়া পড়ে। একটু আধটু যা' চোখে পড়ে, তাহারই ফাঁকে দেখা যায়, তুই-এক খণ্ড লঘু মেঘ ভাসিয়া চলিয়াছে। রাত্রির অন্ধকারে তুই-একটি তারা হয় ত' দেখা যায়, কিন্তু এটুকু আকাশকে তখন আর আকাশ বলিয়া মনে হয় না। মনে হয়, কেউ যেন দূরে আকাশের একটি ছেঁড়া মানচিত্র ঝুলাইয়া রাখিয়াছে।

আর-একটা ব্যাপার তিনি সেল হইতে লক্ষ্য করিতেন। দেখিতেন, অদূরে জেলের মধ্যেই একটা বদ্ধ জায়গার মধ্যে কতকগুলি মানুষ চাকার মত ক্রমাগত ঘুরিয়া চলিয়াছে। উহা আর কিছুই নয়, জল তুলিবার পাম্প। ষোল-সতের জন লোক একসঙ্গে সেই পাম্প ঠেলিয়া জল তুলিত। এরা যেন চিড়িয়াখানার জানোয়ার।

কিছুদিন পরে খুব ভোরে আধ ঘণ্টার জন্য জেলের বাহিরের বড় দেওয়ালের নিকট তাঁহাকে হাঁটিবার এবং দৌড়াইবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। শরীরটাকে একটু সুস্থ রাখিবার জন্য জওহরলাল রোজ প্রায় তুই মাইলের উপর সেখানে দৌড়াইতেন।

এক মাস পর্যন্ত জেলে তাঁহার কোন সঙ্গী ছিল না। তবে মাঝে মাঝে ওয়ার্ডাররা আসিত, কয়েদী ওভারশিয়ারও আসিত, আর আসিত 'লাইফার'রা। দীর্ঘকাল যাহাদিগকে কারাদণ্ড দেওয়া হইয়াছে তাহাদিগকেই 'লাইফার' বলে।

দীর্ঘকাল বলিতে বিশ-ত্রিশ বছর; অনেক সময় আরও অনেক বেশি। ঐ সব লাইফার কয়েদীর কাঁধের কাছে জামার সঙ্গে একটি কাঠের চাক্তি ঝুলান থাকিত, উহাতে লেখা থাকিত কয়েদীর নম্বর, দণ্ডাদেশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং মুক্তির তারিখ। ইতিপূর্ব্বে নৈনী জেলে থাকিতে তিনি এইরূপ একজন লাইফার দেখিয়াছিলেন। তাহার কারাদণ্ড হইয়াছিল পঁচাত্তর বৎসরের জন্য। চাক্তিতে মুক্তির তারিখ লেখা ছিল ১৯৯৬ সাল। সেই বেচারীর কী হইয়াছে কে জানে? হতভাগ্য হয়ত ইতিমধ্যে পৃথিবী হইতেই মুক্তি পাইয়াছে।

এই লাইফারদের জীবন অত্যন্ত শোচনীয়। বাহিরের জগতের সঙ্গে কোন সম্পর্ক তাহাদের থাকে না। কোনদিন বাহিরের কোন মানুষের মুখ পর্য্যন্ত তাহারা দেখিতে পায় না। জেলের বাহিরে যে একটা বিরাট্ পৃথিবী আছে, সেখানে যে সূর্য্য উঠে, হাওয়া ছুটে, নদী বহিয়া যায়, শিশুরা কলরব করে, মা-বোনের স্নেহ ঝরিয়া পড়ে, বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনের প্রীতি-ভালবাসা মনকে শান্তি দেয়,—অন্ধকারে বহুদিন ধরিয়া আবদ্ধ থাকিতে থাকিতে ঐ সকল কথা তাহারা ভুলিয়া যায়। চারিদিকে দেওয়াল, মাঝখানে এতটুকু জায়গা,—উহাই তাহাদের পৃথিবী। সেখানে একা একা বসিয়া তাহারা ভাবে। প্রথম প্রথম তাহাদের ভয় হয়, কখনও তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। ক্রমে যখন সেই সঙ্গীহীন জীবন তাহাদের সহিয়া যায়, তখন

মনের আর কোন অনুভূতি জাগে না। কেবল মাঝে মাঝে ভয় আসিয়া হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। পরে সেই মনও মরিয়া যায়, থাকে কেবল জীর্ণ দেহটা। কলের পুতুলের মত উহা তখন চলাফেরা করে। ইহার চেয়ে মৃত্যুও অনেক ভাল।

লাইফারদের অধিকাংশই ডাকাতি মামলার আসামী। আবার অনেক কৃষকও আছে। জমির জন্য দাঙ্গা করিয়া খুনের অপরাধে তাহাদের কারাদণ্ড হইয়াছে। ইহাদের সকলেই যে অপরাধী তাহা নয়। হয়ত একজন অপরাধ করিয়াছে, আর পাঁচজন তাহার সঙ্গে জড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের মধ্যে এমন অনেক মুখ' দেখিতে পাওয়া যায় যাহাদের দিকে চাহিলেই মনে হয়, এমন সরল লোক কখনও অপরাধ করিতে পারে না। ভাল শিক্ষা পাইলে ইহারা হয়ত দেশের অনেক ভাল কাজে লাগিতে পারে।

অবশ্য এমন অপরাধীও আছে যাহাদের চরিত্র সত্যই ভয়ানক। উহারা চুরি-ডাকাতি, খুন-জখম করিতেই অভ্যস্ত। উহারাই দেশের শত্রু, সমাজের শত্রু। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা খুবই কম। একশ' জনের মধ্যে দশজন কিংবা আরও কম বন্দীই এরূপ অপরাধী। ভাল করিয়া খাইতে পাইলে, চাকরি অথবা ব্যবসায় করিয়া সংসার চালাইবার টাকা যোগাড় করিতে পারিলে, কিছু শিক্ষা পাইলে, হয়ত এমন অপরাধীর সংখ্যাও আর দেশে থাকিবে না। তখন জেলখানারও কোন

প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু ধূর্ত্ত ইংরেজ এসব কথা ভাবিয়া দেখে নাই; একদিকে শোষণে শোষণে দেশকে তাহারা অভাবের দিকে ঠেলিয়া লইয়া গিয়াছে, অন্য দিকে জেলের পর জেলের সংখ্যা বাড়াইয়াছে আর বাড়াইয়াছে পুলিশের সংখ্যা। ১৯৩৩ সালে কেবল বোম্বাই প্রদেশের জেলখানাগুলির কয়েদীর সংখ্যাই ছিল এক লক্ষ আটাশ হাজার। বাংলা দেশে উহাদের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ চব্বিশ হাজার। ১৯৩৪ সালের ১১ই ডিসেম্বর তারিখে ষ্টেট্স্ম্যান্ পত্রিকায় এই সংখ্যার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ সমগ্র ভারতে তখন কয়েদীর সংখ্যা ছিল প্রায় দশ লক্ষ। কয়েদীদের কখনও মানুষ বলিয়া গণ্য করা হইত না। উহাদের মনের উন্নতির চেষ্টা করা ত দূরের কথা। গরু-ছাগলকে যেমন খোঁয়াড়ে পূরিয়া রাখা হয়, ঐ মানুষগুলাকেও তেমনই জেলে পূরিয়া রাখা হইত।

কয়েদীদের মধ্যে পনের-ষোল কিংবা আরও কিছু বেশি বয়সের কিশোর অথবা যুবক কয়েদীদের দেখিলে সত্যই মায়া হয়। ইহাদের কেহই অপরাধে অভ্যস্ত নয়। ইহাদের মধ্যে অনেকেই বেশ বুদ্ধিমান। শিক্ষা এবং সুযোগ পাইলে ইহারা সত্যসত্যই ভাল হইতে পারে। কোন কোন জেলে ইহাদের সামান্য কিছু লেখাপড়া শিখাইবার ব্যবস্থা আছে বটে, তবে তাহা অতি তুচ্ছ। ইহারা সেখানে না পায় খেলাধূলা করিতে, না পায় কোন খবরের কাগজ বা বই পড়িতে।

বার ঘণ্টা কি তাহারও বেশি সময় উহাদিগকে সেলের মধ্যে তালাবন্ধ করিয়াই রাখা হয়।

দীর্ঘ তিন মাস পর পর একবার করিয়া আত্মীয়-স্বজন আসিয়া জেলে উহাদের সঙ্গে দেখা করিতে পারে, কিংবা আত্মীয়-স্বজনের কাছে চিঠি লিখিবার অনুমতি উহাদের দেওয়া হয়। উহাদের অধিকাংশই অশিক্ষিত, লিখিতে পড়িতে জানে না। সুতরাং চিঠিপত্র লেখাইবার জন্য এবং পড়াইবার জন্য ইহাদিগকে জেলের কর্ম্মচারীদের শরণ লইতে হয়। কর্ম্মচারীরা অনেক সময় অপরিষ্কারভাবে পত্রের ঠিকানা লিখিয়া দেয়, উহাতে পত্র আর ঠিক জায়গায় গিয়া পৌঁছায় না। অথচ যাহারা পত্র দেয় তাহারা কত আশা করিয়াই না বসিয়া থাকে!

কারাগারে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করার ব্যাপার আরও কঠিন। জেল-কর্ম্মচারীদের হাতে কিছু গুঁজিয়া দিতে না পারিলে, সেই সৌভাগ্য আর কপালে ঘটিয়া উঠে না। এমন অনেক কয়েদী আছে, যাহারা বহুদিন ধরিয়া প্রিয়-পরিজনের মুখ ত' দেখেই না, তাহারা বাঁচিয়া আছে না মরিয়াছে, সে খবরও তাহারা জানে না।

আত্মীয়-স্বজন যখন জেলে কয়েদীদের সঙ্গে দেখা করিতে আসে তখন একটা মজার ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। কয়েদীগণকে একদিকে দাঁড় করান হয়, আত্মীয়দের অন্যদিকে। মাঝখানে থাকে তারের বেড়া। এপাশ হইতে একদল কথা কহিতেছে,

ওপাশ হইতে আর একদল; সকলেই একসঙ্গে কথা বলিতেছে, ভাল করিয়া শুনিতে পাইবে না বলিয়া সকলেই চীৎকার করিয়া চলিয়াছে জোর গলায়। কী চমৎকার ব্যবস্থা!

হাজারের মধ্যে একজন কয়েদী জেলে ভাল খাইতে পায়, আত্মীয়জনের সঙ্গে ইচ্ছামত দেখা করিতে পারে। রাজনৈতিক বন্দীরাও পান সাধারণ কয়েদীর মত ব্যবহার।

বৈপ্লবিক কাজের অপরাধে দীর্ঘ দিনের জন্য যাঁহাদের প্রতি কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে, তাঁহাদিগকে রাখা হয় নির্জ্জন সেলে। নির্জ্জন কারাবাসের মত ভয়ানক আর কিছুই নাই। মানুষের সঙ্গে কথা না বলিয়া মানুষ থাকিতে পারে না। এক-দিন মানুষের মুখ না দেখিলেই মানুষের প্রাণ হাঁফাইয়া উঠে। সে জায়গায় মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরিয়া যাহারা মানুষের মুখ দেখিতে পায় না, মানুষের সঙ্গে কথা কহিতে পায় না, তাহাদের অবস্থা যে কী হয় তাহা বলিয়া বুঝান যায় না। সঙ্গীহীন অবস্থায় সেলে থাকিতে থাকিতে এই সকল বিপ্লবী-বন্দীরা প্রায় পাগল হইয়া যান, তাঁহাদের চোখে মুখে ফুটিয়া উঠে এক নিরাশার ভাব। মানুষের কোমল ভাবগুলিকে গলা টিপিয়া মারিয়া ক্রমে তাহার মনকেও হত্যা করিবার ইহা এক অভিনব উপায়। মানুষের মনই যদি মরিল তবে তাহার মনুষ্যত্বের রহিল কী? দেহ? সে ত পশুরও আছে। এই মৃত মন লইয়া যখন সেই বন্দী কারামুক্ত হইয়া

গৃহে ফিরিয়া যান, তখন আর সমাজের লোকের সঙ্গে মনকে কিছুতেই মিলাইতে পারেন না। সারাজীবন সেখানেও তাঁহাকে একাই কাটাইতে হয়। এই শাস্তির অপেক্ষা ভীষণ আর কী হইতে পারে?

ইউরোপীয় কয়েদীদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা কিন্তু অন্য রকম। তাহারা যে-অপরাধই করিয়া থাকুক, আর যে-শ্রেণীরই লোক হউক না কেন, জেলে সকলকেই উচ্চ শ্রেণীর কয়েদী হিসাবে রাখা হয়। ছোট-বড়, ধনী-নির্ধনের কোন ভেদ নাই। শাদা চামড়া আর কটা চোখের লোক কি না তাই খাদ্যও পায় ভাল, কাজও করিতে হয় কম, আত্মীয়-বন্ধুর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎও করিতে পায় ঘন ঘন। সপ্তাহে একবার করিয়া পাদ্রীরা সেখানে পদার্পণ করেন। কেবল বাইবেলের বুলিই তাঁহারা আওড়ান না, সঙ্গে আনেন বিদেশী ছবিওয়ালা পত্রিকা বা ব্যঙ্গ-কৌতুকের কাগজ। আবার অনেক সময় পরিবারবর্গের কাছে বহিয়া লইয়া যান প্রয়োজনীয় সংবাদ।

দেশীয় কয়েদীদের তেমন সুবিধা-সুযোগ দেওয়া দূরে থাক, মানুষ বলিয়াই ধরা হয় না তাহাদিগকে। ইংরেজের শাসন ও দমনের নীতি যে কতদূর হীন, তাহা যে কারাগার না দেখিয়াছে সে বুঝিতে পারিবে না। মানুষকে চারিদিক্ হইতে পিষিয়া মারিতে হইবে তাহারই জন্য যেন কারাগার-যন্ত্রের সৃষ্টি। যাঁহাদের সম্মান-জ্ঞান আছে তাঁহাদের মন এখানে কেবলই

অস্বস্তি অনুভব করিতে থাকে। অনেক সময় এই নিষ্ঠুর যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া কোন কোন কয়েদী ছোট শিশুর মত কাঁদিয়া উঠে। কিন্তু হায়! তাহাকে এতটুকু সমবেদনা জানাইবে এমন কাহাকেও সে খুঁজিয়া পায় না।

কিন্তু মানুষের মনকে একেবারে মারিয়া ফেলাও বড় সহজ নহে। শত পেষণেও সে মরিতে চায় না। তাহার দৃষ্টান্ত মাঝে মাঝে কয়েদীদের মধ্যে দেখা যায়। একবার একজন পেশাদার অন্ধ কয়েদী তের বছর পরে জেল হইতে মুক্তি পায়। বাহিরে গিয়াই তাহার বন্ধুবান্ধব মিলিবে না, সাহায্য করিবার কেহ মিলিবে না, এই কথা ভাবিয়া অন্যান্য কয়েদীরা তাহাকে সাধ্যমত সাহায্য করিতে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। একজন তাহাকে জেলে-জমা-দেওয়া সার্টটিই দান করিল, একজন দিল দুই চারিখানা কাপড়। একজন কয়েদী সেই দিন সকালেই এক জোড়া নূতন 'স্যাণ্ডাল' পাইয়াছিল, জেলে উহাই তাহার কাছে লাখ টাকার সম্পত্তি। সেই দুর্লভ ধনকে হাসিমুখে সে তাহার এতদিনকার সঙ্গীকে দান করিয়া দিল। এই সহানুভূতি ও বন্ধুত্বের সঙ্গে কিসের তুলনা দিব? ইংরেজ যত বিক্রমেই রাজত্ব করুক,—ভগবানের রাজত্বকে, তাঁহার করুণার দানকে সে চাপা দিবে কী করিয়া?

কারাগারে জওহরলাল কোন দৈনিক পত্রিকা পাইতেন না। একখানি হিন্দী পত্রিকা আসিত, উহা পড়িয়াই বাহিরের সংবাদ

জানিতেন। দেশের চারিদিকে তখন বিপুল উৎসাহে স্বাধীনতার যুদ্ধ চলিয়াছে। আইন অমান্য করিবার জন্য দেশের লোক যেন পাগল হইয়া উঠিয়াছে। অন্য দিকে পালটা জবাবও চলিতেছে। একদল অস্ত্রহীন, কেবল আত্মার শক্তিতে শক্তিমান: অন্য দলের হাতে হাতিয়ার, পশুবলে তাহারা বলীয়ান। কোথাও পুলিশ লাঠি চালাইতেছে, কোথাও সৈন্যেরা নিরস্ত্র জনতার উপর গুলী ছুড়িতেছে, কোথাও জারি হইয়াছে সামরিক আইন। নির্য্যাতিত দেশবাসীর কথা মনে করিয়া জওহরলালের প্রাণ তাহাদের সঙ্গে মিলিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিত। কিন্তু হায়! তাঁহার চারিদিকে যে বন্ধন। ঐ বন্ধনের বেদনা কী জ্বালাময়!

অবশেষে তিনি স্থির করিলেন, কঠোর কারাগারের মধ্যেই কঠোরতর জীবন যাপন করিবেন। রোজ তিন ঘণ্টা করিয়া তিনি চরকায় সূতা কাটিতে আরম্ভ করিলেন। আরও দুই-তিন ঘণ্টা ধরিয়া 'নেওয়ার', অর্থাৎ চওড়া ফিতা বুনিতে লাগিলেন। মনের আকুলতা তাহাতে অনেকটা শান্ত হইয়া আসিত, পড়াশুনাও করিতেন খুব বেশী! অন্য সময়ে নিজের ঘর ঝাঁট দিতেন, কখনও বা কাপড়-চোপড় কাচিতেন। তাঁহার বিনাশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছিল। এই সকল শারীরিক পরিশ্রমের কাজ তিনি না করিলেও পারিতেন। তবুও করিতেন কেবল মনের উত্তেজনাকে দমন করিবার জন্য।

নৈনী জেলে থাকিবার সময়েই ইংরেজের জেল সম্বন্ধে জওহরলাল বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মনে হইত, ভারতবর্ষে যেমন বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট, জেলখানাগুলিও ঠিক তাহাই। দেশের উপর ইংরেজ সরকার তাহার প্রভুত্ব বজায় রাখিয়াই চলিয়াছে. অথচ দেশের মানুষগুলির প্রতি তাহার কোন লক্ষ্য নাই, দুখ-দরদ নাই। বাহিরের ঠাট ঠিক আছে, ভিতরে পদার্থশূন্য। জেলখানাগুলিকেও বাহির হইতে দেখিলে মনে হয়, সেখানকার কাজকর্ম্ম ঠিকই চলিতেছে। কিন্তু কয়েদীদের উন্নতি করিতে সাহায্য করাই যে জেলখানার প্রধান উদ্দেশ্য, এ কথা কেহ কি একবার ভাবিয়া দেখে? অপরাধের প্রতি ঘৃণা জাগাইয়া তোলাই কারাগারের শিক্ষা হওয়া উচিত। কিন্তু ইংরেজের জেলখানাগুলি যেন কেবল মানুষকে পীড়ন করিতেই সৃষ্ট হইয়াছে। উহাদের লক্ষ্য—কারাগার হইতে ছুটি পাইয়া বন্দীরা যেন আর বাহিরে মাথা তুলিয়া না দাঁড়াইতে পারে। ভারত-রাষ্ট্রের মত জেলেও আবার একরূপ ভেদ-নীতির সৃষ্টি করিয়াছে ইংরেজ। কয়েদীদের ভাগ করিয়া কয়েদীদেরই দিয়া কয়েদীদের শাসন করা হয়। কতকগুলি কয়েদীকে করা হয় মেট্। উহারাই জেলের ভিতর পাহারাদারের কাজ করে। মেট্ হইয়া ভাবে, বড় পদ পাইয়াছি! বড় বড় ভারতীয় সরকারী-অফিসার আর কি! দেশের লোকই দেশের শত্রু হয় বলিয়া ভারতবাসীর এই পরাধীনতার দুঃখ। বড় বড়

নামের কী মোহ! আবার অনেক কয়েদী পুরস্কার লাভের লোভে, অথবা দণ্ডের মেয়াদ কম হইবার আশায় জেলের কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা করিয়া থাকে। তাহা ছাড়া, কয়েদীদের দিয়া গোয়েন্দার কাজও করান হয়। একজনকে আর একজনের উপর নজর রাখিতে বলা হয়, এজন্য নানাভাবে উৎসাহও দেওয়া হয় তাহাদের।

রাজনৈতিক অপরাধের জন্য জওহরলাল বহুবার জেলে গিয়াছিলেন। প্রত্যেকবারই এক-একটা নূতন অভিজ্ঞতা লইয়া তিনি ফিরিয়াছেন। একবার যখন তিনি দেরাদুন জেলে ছিলেন, তখন সেখানে কয়েদীদের উপর কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন। যাঁহারা আইন অমান্য করিয়া জেলে আসিয়াছিলেন, বেত্রাঘাত তাঁহাদের নিত্য সহচর হইয়া উঠিয়াছিল। একবার ইহারই প্রতিবাদে পণ্ডিতজী তিন দিন অনশন পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন।

কেবল বেত্রাঘাত নহে, তাঁহাদিগকে অনেক কঠিন পরিশ্রমের কাজও করিতে হইত। ঘানি ও জাঁতা ঘোরান উহার অন্যতম। অর্থাৎ তাঁহাদিগকে দিয়া এমন কাজ করান হইত, যাহাতে তাঁহারা আর কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া সরকারের নিকট আপনার কৃতকর্ম্মের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতে বাধ্য হন। বালক ও যুবকদের ভাগ্যেই কঠোর পরিশ্রমের কাজ জুটিত বেশি। জওহরলাল ইহাদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "যে শ্রেণীর

বালক ব্রিটিশ বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশংসা ও উৎসাহ পাইত, ইহারা সেই শ্রেণীর। কিন্তু ভারতে তাহাদের যৌবনোচিত আদর্শবাদ ও গর্ব্বের জন্য তাহারা পায় শৃঙ্খল, নির্জ্জন কারাবাস ও বেত্রদণ্ড!"

অবশ্য জওহরলাল নিজে চিরকাল জেলে ভাল ব্যবহারই পাইয়াছিলেন। তবুও তাঁহার মতে, জেল জেলই। সেখানে আনন্দ নাই, হাসি নাই, সময় সময় জেলখানা তাই অসহ্য হইয়া উঠে। জেলের একদিকে যেমন অন্ধকার, সঙ্কীর্ণতা, বন্ধন—অন্যদিকে তেমনই হিংসা, নীচতা, মিথ্যাচার। যাঁহার এতটুকুও মানসম্ভ্রমজ্ঞান আছে, জেলে তাঁহার মন আপনা হইতেই উত্তেজিত হইয়া উঠে। অতি সামান্য ব্যাপারেও অনেকে বিচলিত হইয়া পড়েন। জেলের সমস্ত রকম বন্ধনের মধ্যে মানুষের সহজ মন বিকৃত হইয়া যায়।

নৈনী জেলের মত দেরাদুন জেলেও পণ্ডিতজী ইচ্ছা করিয়াই শারীরিক পরিশ্রম করিতেন। তিনি বলেন যে, উহাতে তাঁহার মেজাজ ঠিক থাকিত। সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া সন্ধ্যায় তিনি শ্রান্ত হইয়া পড়িতেন। অতএব রাত্রের ঘুমটি হইত বেশ আরামের।

ইহার মধ্যেই কখনও কখনও মনে হইত যে, সময় যেন আর কাটিতে চায় না। মাঝে মাঝে মন বিরক্ত হইয়া উঠিত। জেলের সঙ্গীদের উপর, জেল-কর্ম্মচারীদের উপর, বৃটিশ সাম্রাজ্যের

উপর—সকলের উপরেই ভীষণ রাগ হইত। এমন কি মাঝে মাঝে তিনি নিজের উপরও নিজে বিরক্ত হইয়া উঠিতেন।

জেলে জিনিসপত্র পর্য্যন্ত একটু সাজাইয়া রাখিবার যো ছিল না। জওহরলাল যে সেলে থাকিতেন, তাহার পাশের সেলের একজন রাজনৈতিক বন্দী তাঁহার নিত্য ব্যবহার্য্য কয়েকটি জিনিস ঘরে সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া জেল-কর্ম্মচারী আপত্তি করিয়াছিলেন। কর্ম্মচারীটির মত এই যে, জেলখানা বিলাসগৃহ নয়। সেই দ্রব্যগুলি ছিল এই—একটি দাঁত মাজিবার বুরুস, দাঁতের মাজন, ফাউন্টেনপেনের কালি, এক বোতল মাথার তেল, চিরুণী,—এমনি আরও দুই-একটি ছোটখাট জিনিস!

জেলের বন্দীদের কাছে ক্ষুদ্রতম ক্ষুদ্র বস্তুও অতি মূল্যবান। কারণ বেশি জিনিস তাহারা সেখানে দেখিতে পায় না। তাই বাহিরে থাকিলে সে যাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিত না, জেলে তেমন কোন দ্রব্য পাইলে সে মনে করে, পরশ পাথর কুড়াইয়া পাইলাম। অতি যত্নে সে উহাকে ঘরে তুলিয়া রাখে।

সময় সময় আরাম-আয়েসের জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগে, গৃহের কথা মনে হয়, বাপ মা, ভাই বোন, স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, বন্ধুবান্ধবের জন্য মন কাঁদিয়া উঠে, পুরাতন দিনের স্মৃতি মনে পড়িয়া মন উদাস হইয়া যায়, ঘরে ফিরিবার জন্য চিত্ত কেবলই অস্থির হইয়া উঠে।

দেরাহুন জেলে জওহরলাল প্রত্যহ খানিকটা করিয়া সূতা কাটিতেন। বেশীর ভাগ সময় কাটাইতেন লেখাপড়া করিয়া। কোন পুস্তকের প্রয়োজন হইলে বিশেষ পরীক্ষার পর উহা তাঁহাকে দেওয়া হইত। বহু বন্দীকেই অনেক আধুনিক পুস্তক, প্রগতিশীল সংবাদপত্র দেওয়া হইত না। রাজদ্রোহমূলক পুস্তক ত' নয়ই। ইংরেজের জেল দেহকে বন্দী করার সঙ্গে সঙ্গে মনের চারিদিকেও বিধি-নিষেধের প্রাচীর তুলিয়া দেয়। কারাগারে কেবল 'এ' শ্রেণীর বন্দীদিগকে লিখিবার সরঞ্জাম দেওয়া হয়। মাঝে মাঝে দৈনিক সংবাদপত্রও দেওয়া হয়। তবে উহা সরকারের অনুমোদিত হওয়া চাই। 'বি' বা 'সি' কোন শ্রেণীর বন্দীকেই লিখিবার কিছু দেওয়া হয় না। অথচ 'এ' শ্রেণীর বন্দী দেশে প্রতি হাজারে একজনও হইবে কিনা সন্দেহ।

দেরাহুন জেলে পণ্ডিতজী ছিলেন চৌদ্দ মাস পনের দিন। অনেকদিন থাকিবার ফলে দেওয়াল হইতে আরম্ভ করিয়া কড়ি বর্গার খুঁটিনাটি কথা পর্য্যন্ত তাঁহার মনে দাগ কাটিয়া বসিয়াছিল। জেলটি ছিল খুব ছোট। তাই দেওয়ালের বাহিরে অথচ জেলের হাতার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র হাজতে তাঁহাকে রাখা হইয়াছিল। জায়গাটা এত ছোট যে হাঁটিয়া বেড়াইবারও উপায় ছিল না। সেইজন্য সকালে ও বিকালে জেলের দরজা পর্য্যন্ত বেড়াইবার অনুমতি পাইয়াছিলেন তিনি। তিনি জেল হইতেই দূরস্থিত

পর্ব্বত, শস্যক্ষেত্র এবং রাজপথের কিছু অংশ দেখিতে পাইতেন। প্রকৃতির এই দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যে, কত সৌভাগ্যের বিষয় তাহা একমাত্র বন্দীরাই বুঝিতে পারে। হাঁটিতে হাঁটিতে দেখিতেন, দূরে হিমালয়ের উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী অপরূপ শ্রী লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। অনেকক্ষণ ধরিয়া তিনি ঐ মনোরম দৃশ্য দেখিতেন। পরে যখন নিজের সেলে ফিরিয়া আসিতেন, তখনও মনে মনে তিনি যেন হিমালয়কে দেখিতে পাইতেন। কেবল হিমালয় নহে, বসন্ত, বর্ষা, শরৎ প্রভৃতি ঋতুগুলিও যেন তাঁহার কাছে অপূর্ব্ব সুন্দর বলিয়া বোধ হইত।

ক্রমে যাহাই তাঁহার চোখে পড়িত, তাহাই ভাল লাগিত। বিচিত্র বস্তুর সন্ধানে তিনি যতই দৃষ্টি ফিরাইতেন, ততই নানা বস্তু তাঁহার চোখে পড়িত। বিশেষ করিয়া কীট-পতঙ্গ। সামান্য প্রাণীও তখন তাঁহার কাছে হইয়া উঠিত অসামান্য। তিনি দেখিতেন, কীট-পতঙ্গেরা এখানে-ওখানে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহাদের চলিবার ভঙ্গীই বা কত! কেউ বুকে হাঁটে, কেউ চলে ধীরমন্থর গমনে, আবার কেউ বা উড়িয়া বেড়ায়। উহারা কেহই তাঁহাকে বিরক্ত করে না। তবে ছারপোকা ও মশার কথা আলাদা। ঐ দুইটি বিশেষ প্রাণীর সঙ্গে তাঁহাকে লড়াই করিতে হইত। সেই জেলে আবার বোলতা-ভীমরুলও ছিল অসংখ্য। একদিন একটি বোলতা তাঁহাকে কামড়াইয়াছিল। আর যায় কোথা? জওহরলাল রাগিয়া

গিয়া উহাদিগকে সবংশে নিধনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু যখনই মনে পড়িল যে, উহাদের চাকগুলিতে হয়ত অনেক ডিম আছে, তখনই জীবের প্রতি দয়াবশতঃ যুদ্ধে ক্ষান্ত হইলেন। আর কোনদিন উহারা তাঁহাকে উত্যক্ত করে নাই।

পিঁপড়া এবং উইও তাঁহার দৃষ্টি এড়াইত না। টিকটিকিগুলি যখন লাফাইয়া লাফাইয়া শিকার ধরিত এবং নানা ভঙ্গীতে একে অন্যকে তাড়া করিত, তিনি তাহাও চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেন।

জেলের কাছেই একটা গাছে বাস করিত বহু কাঠবিড়ালী। উহাদের মধ্যে কয়েকটি আবার সাহস করিয়া তাঁহার নিকটে আসিতেও দ্বিধা করিত না। কাঠবিড়ালীদের ছোট বাচ্চাগুলি মাঝে মাঝে গাছ হইতে নীচে পড়িয়া যাইত, উহাদের মা আসিয়া তখন উহাদিগকে উপরে তুলিয়া লইয়া যাইত। একবার তাঁহার একজন সঙ্গী, তিনটি কাঠবিড়ালীর হারান বাচ্চা কুড়াইয়া আনিয়া তাঁহাকে দিয়াছিলেন। ফাউন্টেন পেনে কালি ভরিবার কাচের নল দিয়া জওহরলাল উহাদিগকে দুধ খাওয়াইতেন।

প্রায় সব জেলেই তিনি পায়রা দেখিতে পাইতেন। দেরাদুন জেলেও পায়রার অভাব ছিল না। সন্ধ্যার সময় ঝাঁক বাঁধিয়া পায়রার দল উড়িয়া আসিত। জেলকর্ম্মচারীরা অনেক সময় ঐ পায়রাগুলি ধরিয়া মারিত, পরে আহার করিত। ময়নাও ছিল

সেখানে প্রচুর। তাঁহার জেলের দরজার উপরেই একজোড়া ময়না থাকিত। তিনি তাহাদিগকে খাইতে দিতেন। ক্রমে তাহারা খুব পোষও মানিয়াছিল। টিয়া পাখীও ছিল হাজার হাজার। উহারা বাস করিত ব্যারাকের দেওয়ালের ফাটলে।

সময় সময় অবাঞ্ছিত জীবজন্তুও কারাগারে দেখা যায়। যেমন—বিছা, কেন্নুই, সাপ। সাধারণতঃ ঝড় বৃষ্টির পরেই বিছার প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে।

আরও পরবর্ত্তী কালে জওহরলাল যখন কলিকাতার আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে ছিলেন, তখন সেখানে এমন একটি প্রথা দেখিয়াছিলেন যাহা ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশের কারাগারে প্রচলিত নাই। সেই জেলে তিনি দেখিতেন, কয়েদীগণ উচ্চ কর্ম্মচারীর সুমুখে পড়িলেই চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিত,—"সরকার সেলাম।" সঙ্গে সঙ্গে দেহকে বাঁকাইয়া নত হইয়া সেলামের ভঙ্গীও দেখাইতে হইত। জেল সুপারিনটেনডেণ্ট যখন প্রত্যহ জেল পরিদর্শন করিতেন তখনও কয়েদীদের উচ্চকণ্ঠ শোনা যাইত "সরকার সেলাম।"

আজিও এই প্রথা সেখানে আছে কি না, জানি না। তবে ইংরেজ সরকারের প্রবল প্রতাপ যে আর নাই তাহা নিশ্চিত। এখন "সরকার সেলাম" বলিলে সেই সেলাম পৌঁছিবে জাতীয় সরকারের কাছে।

২৬শে জানুয়ারী।

সেদিন ভারতের পুণ্য-পবিত্র স্বাধীনতা দিবস। ভোরের আলো ফুটিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রভাতফেরীর গানে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। পাড়ায় পাড়ায় সব ছেলে-মেয়ের দল ভোর না হইতেই বাহির হইয়া পড়িয়াছে নূতন উদ্দীপনা লইয়া। মুখে-চোখে তাহাদের কঠোর সঙ্কল্প যেন ফুটিয়া উঠিতেছে—স্বাধীনতা চাই-ই। প্রয়োজন হইলে জীবনের বিনিময়ে তাহারা দেশমাতার শৃঙ্খল মোচন করিবে। দেশের চারিদিকে যখন এমনি উৎসাহ উদ্দীপনা, তখন অকস্মাৎ শুনা গেল সুভাষচন্দ্র তাঁহার গৃহে নাই। রহস্যজনকভাবে কোথায় তিনি নিরুদ্দেশ হইয়াছেন!

৪

অভূতপূর্ব্ব বিস্ময়ে সমস্ত দেশ অভিভূত হইয়া পড়িল। সকলের মনে তখন এই প্রশ্ন—সুভাষচন্দ্র কোথায় গেলেন, কেন তিনি দেশত্যাগী হইলেন—ইত্যাদি। ব্রিটিশ সরকারের গোয়েন্দারা তাঁহাকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চোখে-চোখে রাখিয়াছিল। তাহাদের সতর্ক দৃষ্টিকে এড়াইয়া সুভাষচন্দ্র কোথায় যাইতে পারেন? গোয়েন্দা বিভাগের মনে হইল,—না, তাহা কি সম্ভব! চতুর্দ্দিকে কড়া পাহারা—তাহার মধ্য হইতে সুভাষ-চন্দ্র বেমালুম অদৃশ্য হইয়া যাইবেন, ইহা যে কল্পনাতীত! তাই সুভাষচন্দ্রের এলগিন রোডের বাড়ীর ভিতর, বাড়ীর বাহিরে—সমস্ত পাড়ায় এবং অবশেষে সারা কলিকাতায় ও ভারতের সর্ব্বত্র সুভাষচন্দ্রের জন্য তল্লাসী চলিতে লাগিল। গোয়েন্দা ও পুলিশ বিভাগ সকলেই তৎপর হইয়া উঠিল। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের গোয়েন্দা ও পুলিশেরা সুভাষচন্দ্রের কোনো খোঁজ পাইল না।

ওদিকে সুভাষচন্দ্র ছদ্মবেশে ভারতসীমান্ত অতিক্রম করিয়া মস্কো হইয়া বার্লিন যাইয়া উপস্থিত হইলেন। বিপ্লবী বাংলার ছেলে বলিয়াই এমনিতর একটা অসমসাহসিক কাজ করা সুভাষচন্দ্রের পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল।

জার্ম্মানীর সঙ্গে ইংরাজের মহাযুদ্ধ তখন পূরাদমে চলিতেছে। ইংরাজের শত্রুপক্ষ জার্ম্মানীর আশ্রয় তিনি গ্রহণ করিলেন। হিটলার তাঁহাকে 'ফুরার অব ইণ্ডিয়া' বলিয়া গ্রহণ করিলেন।

স্থির হইল যে, সুভাষ একটি ভারতীয় জাতীয় বাহিনী গঠন করিয়া তাহার অধিনায়ক হইয়া স্বাধীন ভারতে প্রবেশ করিবেন।

ভারত ছাড়িয়া সুভাষচন্দ্র চলিয়া যাওয়ার পর হইতে গোয়েন্দা ও পুলিশেরা নিত্যই সতর্ক দৃষ্টিতে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র তাঁহার খোঁজ করিয়া ফিরিতেছিল। অকস্মাৎ একদিন বার্লিন রেডিও হইতে সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠস্বর শুনা গেল—সুভাষ-চন্দ্র ধীর গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিতেছেন—

"বিগত দুইশত বৎসরের বৈদেশিক ইতিহাস আমি গভীর অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়াছি—বিশেষতঃ স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস। কিন্তু কোথাও বৈদেশিক সাহায্য না লইয়া কোন দেশ স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছে, এইরূপ একটি দৃষ্টান্তও পাই নাই। এমন কি ব্রিটেনও তাহার নিজের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আজ শুধু যে স্বাধীন জাতির সাহায্য গ্রহণ করিতেছে এমন নয়, পরন্তু ভারতের মত পরাধীন দেশের সাহায্যও গ্রহণ করিতেছে। এইরকম সাহায্য-ভিক্ষায় যদি ব্রিটেনের কোন দোষ না থাকে তবে, ভারতের পক্ষে তাহার স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য বিদেশের সাহায্য গ্রহণ করায় কোন দোষ আছে বলিয়া আমি মনে করি না। সুতরাং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য আমরা সর্ব্ব-প্রকার সাহায্যই সাদরে গ্রহণ করিব।"

সুভাষচন্দ্রের এই বেতার-বার্ত্তায় স্পষ্টই বুঝা গেল যে, বিদেশী শক্তির সহায়তায় ভারতের স্বাধীনতা আনিবার জন্যই তিনি দেশত্যাগ করিয়াছেন। স্বদেশে থাকিয়া দেশবাসীকে তাঁহার নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী উৎসাহিত করিয়া দেশ-মাতার শৃঙ্খল-মোচনে তিনি সমর্থ হইতেছিলেন না। পদে পদে তাঁহাকে বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হইতেছিল। ব্রিটিশ সরকার তাঁহার মধ্যে এতটুকু কর্ম্মোদ্যম দেখিলেই তাঁহাকে কারাগারে অবরুদ্ধ করিতেন। জীবনের অধিকাংশ কালই তিনি ত কারাগারে কাটাইয়াছিলেন। কিন্তু নীরবে তিনি সে কারা-যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন। কারাযন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে তিনি কতবার নিদারুণ রোগগ্রস্ত হন—তাঁহার মধ্যে যক্ষ্মা-রোগের লক্ষণ পর্য্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠে। তবু নির্ম্মম ব্রিটিশ সরকার তাঁহাকে বারংবারই কারাগারে প্রেরণ করিয়াছেন। দুর্দ্দান্ত কয়েদী মনে করিয়া তাঁহাকে এক জেলে বেশীদিন রাখেন নাই। এখানে-ওখানে ঘুরাইয়াছেন।

শৃঙ্খলিতা দেশমাতার বেদনার তুলনায় সুভাষচন্দ্রের বেদনা অকিঞ্চিৎকর ছিল, ইহা তিনি বুঝিতেন। তাই কারাযন্ত্রণা তিনি চিরদিনই বিনা প্রতিবাদে সহ্য করিতেন। কিন্তু শুধু এই উপায়ে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা আসিবে—এ বিশ্বাস তিনি করেন নাই। সেইজন্যই বিদেশীর সাহায্যপ্রার্থী তিনি হইয়াছিলেন।

কারাগারে সুভাষচন্দ্রের বড় তিক্ত অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল। যে ব্যক্তি নিজের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইবে একথা ভাবিয়া অবলীলাক্রমে আই. সি. এস. পদে ইস্তফা দিয়াছিলেন, যাঁহার মধ্যে স্বাধীনতাবোধ অত্যন্ত প্রবল ছিল—কারাগারে অবরুদ্ধ থাকিয়া তিনি যে কি পরিমাণ বেদনাবোধ করিতেন, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

কারাগারে সুভাষচন্দ্র চিঠি-পত্র পাইতেন। চিঠি-পত্র তিনি নিজেও কারাগার হইতে লিখিতেন। বাহিরের জগতের সহিত যোগাযোগ রাখার ইহাই ছিল কারারুদ্ধ সুভাষচন্দ্রের একমাত্র উপায়। অন্য আর কোন্ উপায়ে বাহিরের জগতে যে সব বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজন রহিয়াছে, তাঁহাদের সহিত হৃদয়ের যোগসাধন হইবে বল? কিন্তু সুভাষচন্দ্র যে-সব চিঠিপত্র লিখিতেন সেই সব চিঠি অনেক হাত ঘুরিয়া—জেল-কর্তৃপক্ষের দ্বারা অনেকবার পঠিত হইয়া তারপরে বিলি হইত। যে সব চিঠি তাঁহার কাছে আসিত, সেগুলিরও ঐ একই দশা হইত। সুভাষচন্দ্রের অন্তর ইহাতে পীড়িত হইত। এজন্য মনের সব কথা সবসময়ে তিনি তাঁহার চিঠিতে খুলিয়া লিখিতে পারিতেন না। চিঠিতে থাকে একজনের উদ্দেশ্যে আর এক জনের মনের কথা। যাঁহাকে সে চিঠি লেখা হইতেছে তিনি ভিন্ন অন্য আর কেহ উহা পড়িবে এ কল্পনায় অন্তর ব্যথিত হইবারই কথা। কারণ

এটা কেহই চাহে না যে, তাহার অন্তরের গভীরতর প্রবাহগুলি দিনের উন্মুক্ত আলোতে সবাইকার সামনে প্রকাশ হইয়া পড়ুক। সেইজন্য পাথরের প্রাচীর আর লৌহদ্বারের অন্তরালে বসিয়া সুভাষচন্দ্র কতদিন কত কথা ভাবিয়াছেন বা অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মনের কথা জেলখানার বিধি-নিষেধের জন্য মনের মধ্যেই লীন হইয়া গিয়াছে। আলো-বাতাসের জগতে তাহা কোনদিনও আত্মপ্রকাশ করে নাই।

ভারতবর্ষে যখন স্বাধীনতার আন্দোলন চলিতেছিল, সেই সময়ে সহস্র সহস্র লোককে বিনা বিচারে—অকারণে অথবা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত কারণে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হইতেছিল। সুভাষচন্দ্রকেও অনেকবারই এইরূপ অকারণে অথবা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত কারণে অবরুদ্ধ হইতে হইয়াছিল। এই বিধান তাঁহার ভাল লাগিত না। সভ্যজগতে বিনা বিচারে মানুষ কারাগারে অবরুদ্ধ হইয়া পচিয়া মরিবে, ইহা তিনি বরদাস্ত করিতে পারেন নাই।

জেলখানার আবহাওয়া সুভাষচন্দ্রের আদৌ ভাল লাগিত না। তিনি অহরহ জেলখানার ভিতরকার ব্যবস্থা ইত্যাদি লক্ষ্য করিয়া এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছিলেন যে, সেখানকার আবহাওয়া মানুষকে যেন বিকৃত ও অমানুষ করিয়া তোলারই উপযোগী—মানুষকে সংশোধন করার উপযোগী জেলখানার ভিতরকার আবহাওয়া মোটেই নয়। অপরাধীদের অধিকাংশেরই

কারাবাস-কালে নৈতিক উন্নতি হয় না এবং তাহারা আরো হীন হইয়া পড়ে। সুভাষচন্দ্র মাঝে মাঝে অনুভব করিতেন যে, কারা-শাসনের একটা আমূল সংস্কারের প্রয়োজন। আমেরিকা প্রভৃতি অনেক পাশ্চাত্য দেশে কারাবাসীদিগের নৈতিক উন্নতির প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয়। তাই সেখানে কারাবাসীদের জীবন দুর্ব্বিষহ বলিয়া বোধ হয় না। সুভাষচন্দ্র সেই সকল পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে কারাসংস্কার চাহিয়াছিলেন।

সুভাষচন্দ্র লক্ষ্য করিতেন যে, আমাদের দেশের কারাগার-সমূহে অপরাধীদিগের প্রতি কারা-কর্ত্তৃপক্ষের কোন সহানুভূতি নাই। তাই এদেশের বন্দীরা কোনদিন শোধরায় না। কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া পুনরায় তাই তাহারা একটা-না-একটা দোষ করিয়া কারাগারে ফিরিয়া যায়।

সুভাষচন্দ্র বলিয়া গিয়াছেন যে—তিনি নিজে কারাবাস করিয়া কারাবাসীদিগের অভিশপ্ত জীবনধারণ-প্রণালী লক্ষ্য করিয়াছিলেন বলিয়াই কারাবাসীদিগের প্রতি তাঁহার একটা আন্তরিক সহানুভূতি জন্মিয়াছিল। তিনি এমন কথাও বলিয়াছেন যে—আমাদের দেশের চিত্রকর আর সাহিত্যিকদিগের যদি কিছু কিছু কারাজীবনের অভিজ্ঞতা থাকিত, তাহা হইলে আমাদের শিল্প সাহিত্য যথেষ্ট পরিমাণেই সমৃদ্ধ হইত। কবি কাজি নজরুল ইসলামের অনেক কবিতাই যে, তাঁহার কারাজীবনের অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর বহন করিতেছে, একথা অস্বীকার করিবে কে?

কারাগারের নির্জ্জনতায় মানুষ সমাজ-সংসার হইতে নির্লিপ্ত হইয়া অনেক কথা চিন্তা করিবার অবসর পায়। মানুষের মধ্যে একটা দার্শনিক ভাবের উদয় হইয়া থাকে—সুভাষচন্দ্র একথা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। লোকমান্য তিলক কারাবাসকালেই গীতার সমালোচনা লেখেন।

কিন্তু সেই কারাগারই যে মানুষের সমস্ত জীবনীশক্তিটুকুকে নিঙ্‌ড়াইয়া লইয়া তাহাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দেয়—এ জিনিসটাও সুভাষচন্দ্রেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়ায় নাই। তাই তিনি বলিয়াছেন, "আমার নিশ্চিত ধারণা যে, মান্দালায় জেলে ছ'বছর বন্দী হয়ে থাকাটাই লোকমান্য তিলকের মৃত্যুর কারণ।"

কারাগারে যে নির্জ্জনতার মধ্যে মানুষকে দিন কাটাইতে হয়, সেই নির্জ্জনতাই তাহাকে জীবনের শত শত জটিল সমস্যাকে তলাইয়া বুঝিয়া দেখিবার সুযোগ দেয়। সুভাষচন্দ্র তাঁহার কারাবাস-কালে নিরালায় বসিয়া ভারতের অনেক জটিল সমস্যার সমাধান নিশ্চিন্তমনে করিতে পারিয়াছিলেন। বাহিরের কর্ম্ম-কোলাহলময় জগতে থাকিয়া যে সকল সমস্যার সমাধান তিনি করিতে পারেন নাই, কারাগারের নির্জ্জনতায় সে সব সমস্যা খুব সহজভাবে তিনি মীমাংসা করিতেন। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে কারাজীবন মানুষের কাছে অভিশাপ নয়—আশীর্ব্বাদ।

কিন্তু কারাজীবনের অভিশাপও সুভাষচন্দ্র মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল কারাপ্রাচীরের অন্তরালে কত

জায়গায়ই ছিলেন। সেই সময়ে তিনি দেখিতেন যে, বেশী দিনের মেয়াদী কয়েদীকে তাহার অজ্ঞাতসারে অকালবার্দ্ধক্য আসিয়া চাপিয়া ধরে। মানুষ দেহে ও মনে জরাগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখী হইতেছে—সুভাষচন্দ্র স্পষ্টই ইহা দেখিয়াছিলেন। খারাপ খাবার, ব্যায়াম আর স্ফূর্ত্তির অভাব, সমাজ-সংসার লোকালয় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকা, একটা অধীনতার শৃঙ্খলভার, বন্ধুজনের অভাব এবং সঙ্গীতের অভাব কারাবাসী মানুষের জীবনকে ব্যর্থ বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলে।

আলিপুর জেলে ইউরোপীয় বন্দীদের জন্য সঙ্গীতের সাপ্তাহিক বন্দোবস্ত ছিল—কিন্তু মান্দালয়ের বা ভারতের অন্য কোন জেলে ভারতীয় কয়েদীদের জন্য, সে রকম কোন ব্যবস্থা না থাকায় সুভাষচন্দ্র বিরক্তি বোধ করিতেন। তিনি ভাবিতেন—ভারতীয়ে ও ইউরোপীয়ে এই বৈষম্য কেন?

পিকনিক, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা, সঙ্গীত-চর্চ্চা, খোলা জায়গায় খেলাধূলা করা, মনের মত গল্প কবিতা উপন্যাস পাঠ করা—এ সমস্ত বিষয়ই আমাদের জীবনকে অনেক-সরস ও সমৃদ্ধ করিয়া তোলে। মানুষ বন্দী হইলে তখন এই সকল জিনিসের মর্য্যাদা বা মূল্য বোঝে। সুভাষচন্দ্রও বন্দী হইয়া এই সকল জিনিস যে জীবনের পক্ষে কি রকম দরকারী তা বুঝিয়াছিলেন। বন্ধু-বান্ধবদিগের সহিত, আত্মীয়-স্বজনদিগের সহিত মিলিত হইবার জন্য তিনি প্রায়ই

মনে মনে ব্যাকুল হইতেন। গান, সাহিত্য-চর্চ্চা ও ব্যায়ামের জন্য তিনি বিশেষ আগ্রহান্বিত হইতেন। কিন্তু কারাগারের ভারতীয় কয়েদী বলিয়া এ সকলের কোন সুবিধাটুকুই তাঁহার জুটিত না।

জেলে চুরি-ডাকাতি প্রভৃতির যত কয়েদী, সকলকার প্রতি সুভাষচন্দ্রের ছিল, একটা অকৃত্রিম অনুরাগ আর সহানুভূতি। তিনি জানিতেন যে এই সব কয়েদীদের প্রতি মানবসমাজ সহানুভূতিহীন। যেদিন তাহারা মুক্তি পাইয়া বাহিরের জগতে গিয়া দাঁড়াইবে, সেই দিন সকলে তাহাদিগকে ঘৃণা করিবে। যেখানে সকলের সহানুভূতির অভাব, সুভাষচন্দ্রের সহানুভূতি ছিল সেইখানে। তিনি পাপকে ঘৃণা করিতেন, পাপীকে ঘৃণা করিতেন না। পাপীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে শোধরাইবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মধ্যে ছিল।

কারাগারে দেহের কষ্টের চেয়ে মনের কষ্ট সুভাষচন্দ্র বেশী পাইতেন। অন্যান্য কয়েদীরাও যে দেহের কষ্টের চেয়ে মনের কষ্ট বেশী পাইতেছে তাহা তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি দেখিতেন যে, জেলখানায় অত্যাচার আর অপমান বড় প্রবল। তাই কারাজীবন বড় যন্ত্রণাদায়ক, অতিশয় কঠোর ও নিরানন্দময়। আনন্দের লেশ সেখানে নাই।

বিজয়লক্ষ্মী পাণ্ডিত

নৈনী কারাগারের অন্তরালে

১৯৪২ সাল। ভারতের সর্ব্বত্র জ্বলিয়া উঠিয়াছে আগষ্ট বিপ্লবের বহ্নি। গান্ধীজী স্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ইংরাজকে শুনাইয়া দিয়াছেন—"ভারত ছাড়।" সমস্ত ভারত তাঁহার 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর-পাতনে'র মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে! দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা 'করেঙ্গে য়্যা মরেঙ্গে' বলিয়া পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছে। আমলাতন্ত্রী ইংরাজ সরকার পরাধীন জাতির মধ্যে সাগরের জলোচ্ছ্বাসের মত উন্মত্ততা লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। সুরু হইয়াছে প্রচণ্ড দমননীতি। লাঠি, কাঁদুনে গ্যাস, গুলি, গ্রেপ্তার, গৃহদাহ, লুণ্ঠন, সম্পত্তি ক্রোক, পাইকারী পিটুনী জরিমানা, অত্যাচার-নিপীড়নের তাণ্ডব লীলা চলিয়াছে

অবলীলাক্রমে। ইংরাজ-শাসনের এই সকল অমানুষিক অত্যাচার-নিপীড়নের কথা দেশ-বিদেশে যাহাতে ছড়াইয়া পড়িতে না পারে, সেজন্য সংবাদপত্রের উপরে জারি করা হইয়াছে কড়া নিষেধাজ্ঞা। কংগ্রেসকেও তাঁহারা বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

ব্যাপক ধর-পাকড় আরম্ভ হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী গ্রেপ্তার হইয়াছেন—কংগ্রেসের সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ গ্রেপ্তার হইয়াছেন—কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের এবং বড় বড় সব দেশনেতাদের গ্রেপ্তার চলিতেছে অপ্রতিহতভাবে। বড়লাট লিন্‌লিথগো কংগ্রেসের বড় বড় নেতাদের জেলে পুরিয়া জাগ্রত ভারতের স্বাধীনতার জোয়ারকে ঠেকাইয়া রাখিতে চাহিতেছিলেন।

সেই সময়ে একদিন—রাত্রি তখন প্রায় দুইটা। চারিদিক গাঢ় আঁধারে ঢাকা। কালো রঙের ক'খানা প্রিজ্‌ন ভ্যান হেড্‌ লাইট জ্বালাইয়া হু হু শব্দে এলাহাবাদ শহরের এ-পথ সে-পথ ঘুরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল একটি বাড়ীর সামনে। গাড়ী হইতে বেশ কয়েকজন সশস্ত্র পুলিশ প্রহরী নামিয়া বাড়ীখানাকে ঘিরিয়া ফেলিল। উহারা শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছে।

শ্রীযুক্তা পণ্ডিত ঘুমে অচৈতন্য ছিলেন। তাঁহাকে ডাকিয়া তুলিয়া তাঁহার বাড়ীর লোকেরা খবর দিল — গ্রেপ্তারের

পরোয়ানা লইয়া পুলিশ আসিয়াছে। কারাগারে যাত্রা করিবার জন্য শ্রীযুক্তা পণ্ডিত প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

একে একে বাড়ীর সকলে জাগিয়া গেল। তাঁহার কন্যারা জাগিল। দেশনেত্রী মায়ের মেয়ে ত! মায়ের গ্রেপ্তারের পরোয়ানা লইয়া পুলিশ আসিয়াছে শুনিয়াও তাহাদের চোখে এক ফোঁটা জল দেখা গেল না। তাহারা বসিয়া গেল তাহাদের মায়ের সুটকেশ গুছাইয়া দিতে। অল্পক্ষণ পরেই শ্রীযুক্তা পণ্ডিত তৈয়ারী হইয়া লইলেন, তাঁহার মেয়েরা সুটকেশ গুছাইয়া তাহাদের মাকে বিদায় দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই ছিল।

শ্রীযুক্তা পণ্ডিত পুলিশের গাড়ীতে উঠিবার জন্য বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহার মেয়েরা এবং বাড়ীতে অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা শ্রীযুক্তা পণ্ডিতের পিছনে পিছনে বাড়ীর বাহিরের বারান্দায় আসিলেন। পুলিশ কর্ম্মচারীরা, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি সেখানে শ্রীযুক্তা পণ্ডিতের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন।

বিদায়কালে শ্রীযুক্তা পণ্ডিতের এক মেয়ে তাহার মাকে বলিল,—"তাহলে এসো মা মণি! স্বাধীনতার পতাকা আমরা উড়িয়ে রাখব!" তাঁহার আর এক মেয়ে বলিল,—"জেলে সাবধানে থেকো মা-মণি! তুমি যখন জেলের ভিতর থাকবে, আমরা তখন বাইরে ইংরাজের সঙ্গে লড়াই চালাব।"

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আর পুলিশ কর্ম্মচারী প্রভৃতিরা আত্মীয়-স্বজন এবং মেয়েদের কাছ হইতে শ্রীযুক্তা পণ্ডিতের বিদায়ের দৃশ্য দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। তাঁহারা ভাবিলেন—ইঁহাদের এই বিচ্ছেদ কতদিনের, তাহার ত কোন নিশ্চয়তা নাই। তবু কাহারও চোখে এক ফোঁটা জল নাই, এতটুকু হা-হুতাশ নাই। জীবনের দুঃখকষ্ট এবং প্রিয়জনের বিচ্ছেদ-দুঃখ সহ্য করিবার শক্তি ইঁহাদের আসে কোথা হইতে?

বিদায়ের পালা শেষ করিয়া শ্রীযুক্তা পণ্ডিত পুলিশ লরীতে উঠিলেন। চারিদিকের প্রশান্তি মথিত করিয়া লরীখানা গর্জ্জন করিয়া উঠিল। তারপর তাঁহাকে লইয়া পুলিশের লরী ছুটিল নৈনীর পথে। সেই রাত্রেই সেখানে পৌঁছিয়া শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতকে পুলিশ সমর্পণ করিল জেল-কর্ত্তৃপক্ষের হাতে। জেলের একটা কামরায় তাঁহার থাকার জায়গা দেওয়া হইল। সেখানে বিছানা পাতিয়া শ্রীযুক্তা পণ্ডিত ঘুমাইলেন।

পরদিন সকালবেলা যখন তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিল, তখন বেশ বেলা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু শরীর ছিল ক্লান্ত, তাই বিছানাতেই শুইয়া রহিলেন তিনি। ভাবিলেন, যতক্ষণ না ঘর ঝাঁট দিবার জন্য কেউ আসিতেছে, ততক্ষণ শুইয়া থাকা যাক।

বেশ খানিকক্ষণ শুইয়া থাকার পর তিনি শয্যা ত্যাগ করিলেন। তারপর জেলখানার ভিতরে যে-রকম বে-বন্দোবস্ত

দেখিলেন তাহাতে তাঁহার মন বিরক্তিতে ভরিয়া গেল। জল নাই, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কোন ব্যবস্থা নাই। সাধারণ কয়েদীদের জলের কল হইতে একটু জল পাইয়া তিনি তাহাতে মুখ ধুইলেন। দুপুরের দিকে কিছু কাঁচা খাবার-দাবার তাঁহাকে পাঠান হইল। কিন্তু কয়লা নাই......রান্না করিবেন কি উপায়ে ? একজন কয়েদীর সাহায্যে কিছু কাঠকুটো জোগাড় করিয়া আগুন জ্বালিয়া তিনি রাঁধিবার চেষ্টা সুরু করিলেন। সে চেষ্টা নিস্ফল হইতেছিল, আগুন জ্বলিতেই চাহে না। কোন রকমে আধসিদ্ধ রান্না তিনি গলাধঃকরণ করিলেন। তারপর বই পড়িয়া, ঘুমাইয়া বেলা গড়াইয়া আসিল। সন্ধ্যা ছ'টায় সকল কয়েদীকে ঘরে ফিরিয়া তালা বন্ধ করা হইল। শ্রীযুক্তা পণ্ডিতকেও। কিন্তু তালা বন্ধ করিবার আধঘণ্টা বাদেই জেলখানার মেট্রন ফিরিয়া আসিয়া জানাইলেন যে, শ্রীযুক্তা পণ্ডিতের ঘরখানার তালা খুলিয়া দিবার অনুমতি তিনি পাইয়াছেন। সুতরাং তিনি ইচ্ছা করিলে ঘরের ভিতরে বা ঘরের বাহিরে উঠানে যে কোন জায়গায় শুইয়া রাত কাটাইতে পারেন। এই হুকুমটুকু পাইয়া শ্রীযুক্তা পণ্ডিত খুসিই হইলেন। তিনি বাহিরের উঠানে বিছানা পাতিয়া বই পড়িতে লাগিলেন। কিন্তু নানান্ চিন্তায় তখন তাঁহার মন ভরাক্রান্ত। তাঁহার চোখ ছিল বইয়ের পাতার উপর, কিন্তু মন ছিল অন্যমনস্ক।

এমনি সময়ে মাঝে মাঝে জেলখানার উঁচু পাঁচিলের ওপার হইতে "ইনকিলাব জিন্দাবাদ" প্রভৃতি ধ্বনি তাঁহার কানে আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। শ্রীযুক্তা পণ্ডিতের মনটা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। আকাশে তখন তারা ফুটিয়াছে—তিনি কিছুক্ষণ আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিয়া, আবার বই পড়ায় মন দিলেন। কিন্তু রাত সাড়ে ন'টাতেই আলো নিবাইয়া দিতে হইল পোকার উৎপাতে। এমনিভাবে বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া সুরু হইল শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের কারাজীবন।

শ্রীযুক্তা পণ্ডিত জেলখানায় নিজের রান্না নিজেই করিয়া লইতেন। ইচ্ছা করিলে তিনি অবশ্য জেলের রান্না খাবার আনাইয়া নিজের পরিশ্রমটুকু বাঁচাইতে পারিতেন। কিন্তু জেলখানার রান্না এমনই কদর্য্য যে, তাহা খাইবার প্রবৃত্তি শ্রীযুক্তা পণ্ডিতের হইত না। তিনি দেখিতেন, কয়েদীদের জন্য যে রান্না করা খাবার পাঠান হয়, তাহা দেখিতে যেমন ভয়ানক, খাইতেও তেমনিবিস্বাদ। ডাল নামে যে অদ্ভুত পদার্থটি পরিবেশন করা হইত, তাহা গোটা-কয়েক লাললঙ্কা ভাসানো নোংরা খানিকটা জলমাত্র। তরকারির রকমফের দেখা যায় না, একঘেয়ে তরকারি অরুচিকর। তা ছাড়া তাহাতে এত বালি আর কাঁকর যে, উহা যে ধুইয়া রান্না করা হয় এমন বিশ্বাস হয় না। রান্না তরকারি ভাল করিয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া খাওয়াও নিরাপদ নহে। কারণ,

নাড়াচাড়া করিতে গেলে সেই কদর্য্য তরকারির মধ্য হইতে কি যে বাহির হইয়া পড়ে কে জানে? তরকারির পরিমাণও থাকিত অত্যন্ত কম। চায়ের সঙ্গে যে রুটি দেওয়া হইত, সেই রুটিগুলির মধ্যেও খালি কিচকিচ করিত --দাঁতে দেয় কার সাধ্য! কিন্তু ক্ষুধার জ্বালায় কয়েদীরা তাহাই খাইত।

জেলখানার রান্না যেমন কদাকার, সেখানকার চা আরও বিশ্রী জিনিস। সে যে কি চীজ তাহা না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না। শ্রীযুক্তা পণ্ডিত জেলের বাহিরে যখন ছিলেন তখন চীন হইতে ম্যাডাম চিয়াং-কাইশেক মাঝে মাঝে তাঁহাকে অপরূপ সুগন্ধি নানারকম চা পাঠাইতেন। সেই চা হইতে সুরু করিয়া ইলেকশান-অভিযানের সরবৎ-গোছের যে পানীয় চায়ের নাম করিয়া পান করিতে দেওয়া হয় সে সকলই শ্রীযুক্তা পণ্ডিত পান করিয়াছিলেন। কিন্তু জেলের চায়ের তুলনা এ মহীমণ্ডলে আর নাই। কবিরাজী পাঁচনও বোধ হয় এই জেলখানার চায়ের চেয়ে ভাল, একথা শ্রীযুক্তা পণ্ডিতের অহরহ মনে হইত।

জেলখানার চা এবং রান্না করা খাবার দুইই অতি কদর্য্য ছিল বলিয়া শ্রীযুক্তা পণ্ডিত নিজের চা এবং খাবারের ব্যবস্থা নিজেই করিতেছিলেন। কিন্তু তাহাতেও কি নিশ্চিন্ত হইবার উপায় ছিল? জেলখানা হইতে রান্নার জন্য তাঁহাকে দেওয়া হইত ভিজা কাঠ।

তাহা হইতে আগুনের চেয়ে ধোঁয়া বাহির হইত বেশী, সেই ধোঁয়ায় বসিয়া রান্না করা মাঝে মাঝে শ্রীযুক্তা পণ্ডিতের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিত। রান্নার জন্য কাঁচা চাল-ডাল তরি-তরকারি ইত্যাদি যাহা তাঁহাদিগকে দেওয়া হইত, তাহা অত্যন্ত নীরস—চালডালে আবার ধূলাবালি মিশান থাকিত। খুব সম্ভবতঃ ওজন বাড়াইবার জন্য উহার মধ্যে ছোট ছোট পাথরকুচি ও মাকড়সা থাকিত। চাল-ডাল পরিষ্কার করিবার সময়ে সে সকল শ্রীযুক্তা পণ্ডিতের হাতে পড়িত। পাথরকুচিগুলি বাছিয়া পরিষ্কার করিবার পর তিনি দেখিতেন যে, চালডালের ওজন বেশ কমিয়া গিয়াছে। খাবার জিনিসে যে-সব ময়লা তিনি পাইতেন, সে-সকল তিনি জমাইয়া রাখিতেন। উদ্দেশ্য এই যে, জেলখানা পরিদর্শনের জন্য কোন উপরওয়ালা হোমরা-চোমরা কর্ত্তৃপক্ষ আসিলে সেগুলি তিনি দেখাইবেন এবং প্রতিকার প্রার্থনা করিবেন। যে ঘি তিনি পাইতেন, তাহার রং ছিল গাঢ় বাদামী, গন্ধটাও বিশ্রী।

ভিজা কাঠের সাহায্যে বাজারের সবচেয়ে কদর্য্য জিনিস রান্না করিয়া খাইতে খাইতে শ্রীযুক্তা পণ্ডিত অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেইজন্য তিনি জেলের সওদার বদলে একবার রোজ একটা করিয়া পাঁউরুটি, কিছু মাখন ও কাঁচা সব্জী চাহিলেন। কিন্তু তাহাতেও কি বিপদ্ হইতে মুক্ত হওয়া সম্ভব ছিল! তাহাতেও নিশ্চিন্ত হইবার

উপায় ছিল না। যে সকল সব্জী তাঁহাকে পাঠান হইত, তাহা যেমন বাসি তেমনি খারাপ। আলু প্রায়ই দেওয়া হইত না। কারণ উহার বাজার-দর চড়া ছিল। যদি বা কোনদিন আলু আসিত তবে দেখা যাইত সে আলুর বেশীর ভাগই পচা। এত খারাপ জিনিস কেন তাঁহাকে দেওয়া হইতেছে, এ কৈফিয়ৎ একবার তিনি জেল কর্ত্তৃপক্ষের কাছে জানাইলেন। উত্তরে জানিতে পারিলেন যে, বাজারে জিনিসপত্রের দাম অত্যন্ত চড়া, তাই সস্তার জিনিস তাঁহাকে দেওয়া হয়। দামী সরেস জিনিস বেশী দামে কিনিয়া দিতে জেলখানা অক্ষম।

রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে শ্রীযুক্তা পণ্ডিত দৈনিক ন' আনা করিয়া পাইতেন। সেই পয়সায় খুশীমত কোন খাবার-দাবার কেনার স্বাধীনতা তাঁহার ছিল। সুতরাং জেল কর্ত্তৃপক্ষকে তিনি জানাইলেন যে ঐ পয়সায় তাঁহাকে যেন ফল কিনিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু জেল-কর্ত্তৃপক্ষ এমনই দীর্ঘসূত্রী যে খাইবার জন্য ফল চাহিলে দশ-বারো দিনের আগে তাহা তাঁহার হাতে পৌঁছিত না। আর সে ফলও এমন কদর্য্য যে তাহা মানুষের অখাদ্য। কলাগুলি থাকিত পচা, থ্যাঁৎলানো। অন্যান্য ফলও হয় পচা, নয় শুকনা দেওয়া হইত। জেলের এইরূপ অব্যবস্থায় শ্রীযুক্তা পণ্ডিত অতিষ্ঠ হইয়া একবার উপরওয়ালাদের কাছে তাঁহার নালিশ জানাইবেন বলিয়া শাসাইয়াছিলেন। ইহাতে জেলের কর্ত্তৃপক্ষমহলে বেশ

সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল এবং তাহার পরদিনই তাঁহাকে বেশ ভাল দুইটি কাশ্মীরী আপেল পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

জেলের সব-কিছুই এলোমেলো ও বে-বন্দোবস্ত। কোন বিষয়ে কারও যে কোন বিশেষ দায়িত্বজ্ঞান ছিল, এ পরিচয় শ্রীযুক্তা পণ্ডিত একদিনের জন্যও পান নাই। জেলের বাগানে প্রচুর তরি-তরকারি হইত। কিন্তু কয়েদীদিগকে যে তরকারি সরবরাহ করা হইত তাহা বাজারের কেনা। কারণ জেলে যাহা হইত, তাহা প্রথমে যাইত বড় বড় উপরওয়ালাদের ঘরে। তারপর নামিতে নামিতে সেই টাটকা ভাল তরি-তরকারির খানিকটা ভাগ নীচেকার কর্ম্মচারীদের কাছে যাহা পৌঁছিত তাহা হইতে তাঁহারা তাঁহাদের খোসামুদে কয়েদীদের কিছু কিছু ভাগ করিয়া দিতেন। রাজনৈতিক বন্দীরা কাহারও খোসামোদের ধার ধারিতেন না। তাই তাঁহাদের কাছ পর্য্যন্ত কোনদিনই ঐ তরি-তরকারির এক টুকরাও পৌঁছিত না।

জেলখানায় ঘুষ জিনিসটা যে কি পরিমাণে চলিত তাহা লক্ষ্য করিয়া শ্রীযুক্তা পণ্ডিতের গা রাগে একেবারে রি রি করিত। সেখানে ঘুষের নানান্ ফিকির ছিল। কখনো কখনো বেশ প্রকাশ্য-ভাবেই সেখানে ঘুষ দেওয়া হইত। কয়েদীদের সঙ্গে তাহাদের আত্মীয়-স্বজন যাহারা বাহির হইতে দেখা করিতে আসিত, তাহাদের কাছ হইতেও ওয়ার্ডারদিগকে ঘুষ আদায় করিতে শ্রীযুক্তা পণ্ডিত দেখিয়াছিলেন।

জেলখানার যে ব্যারাকে শ্রীযুক্তা পণ্ডিতকে থাকিতে দেওয়া হইয়াছিল, সেটা দশ-বারো জন থাকিতে পারে এমন একটি চৌকা ঘর। ঘরের দু'ধারেই দু'চার হাত অন্তর গরাদে দেওয়া——তাহারই মাঝখানে একটি গরাদে দেওয়া দরজা। রাত্রে তাহাতে খিল দিয়া চাবি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইত। ঘরখানার মধ্যে আসবাবের মধ্যে ছিল শুধুমাত্র একখানা জেলের খাট, আর একটা নড়বড়ে লোহার টেবিল। ঘরটা কতদিন যে মেরামত হয় নাই তাহার ঠিক-ঠিকানা ছিল না। মাঝে মাঝে ছাদ হইতে রাবিশের চাঙ্‌ড়া খসিয়া পড়ায় শ্রীযুক্তা পণ্ডিতের বিছানা মেঝে সব নোঙ্‌রা হইয়া যাইত। টালিগুলো এমন বিশ্রীভাবে সাজান ছিল যে, রোদ-বৃষ্টি কোন মানা না মানিয়া দিব্যি অবাধে ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিত। মেঝেটা এমনি এবড়ো-খেবড়ো ছিল যে হাঁটিতে গেলে হোঁচট না খাইয়া এক পা চলার উপায় ছিল না।

গরমের দিনে শ্রীযুক্তা পণ্ডিতের ঘরখানি একটা আগুনের চুলীর মত হইয়া উঠিত—তাঁহার মনে হইত যেন তিনি একটা ইঞ্জিনের বয়লারের মধ্যে রহিয়াছেন; এমনি অসহ্য দমবন্ধ করা গরম! দিন যত বাড়িত, সূর্য্য যতই মাথার উপর উঠিত, শ্রীযুক্তা পণ্ডিত ততই ঘামিয়া স্নান করিতেন—তাঁহার তখন মনে হইত যেন তিনি একটা ছোটখাট টার্কিশ বাথে রহিয়াছেন। ইহার উপর আবার গরম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ঘরে আসিয়া

জুটিত, যত রাজ্যের মাছি, মশা, পিঁপড়া আর হরেকরকমের পোকামাকড়। গরমের রাত্রিতে ঘুম আসিতে চাহিত না। কিন্তু নিশ্চিন্ত হইয়া শুইয়া থাকাও যাইত না। রাত্রির নির্জ্জনতার মধ্যে একদিকে জেলখানার ওয়ার্ডাররা সমস্ত নীরবতাকে ভাঙ্গিয়া সকলের ঘুম ভাঙ্গাইয়া ও বিরক্তি জন্মাইয়া ঘণ্টায় ঘণ্টায় কয়েদী গণিত, আর অন্যদিকে মশার দল ঝাঁক বাঁধিয়া আসিয়া এমন ঐক্যতান সঙ্গীত আরম্ভ করিয়া দিত যে, তাহাতে শ্রীযুক্তা পণ্ডিতের মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করিত। সারারাত্রি প্রায় অনিদ্রাতেই ছটফট করিয়া কাটিত। তারপর ভোরের দিকে একটু ঘুম আসিত। কিন্তু চারিদিকের কলরবে তাঁহার আর ঘুমান সম্ভব হইয়া উঠিত না।

গ্রীষ্মকালে ছুপুরবেলা মাঝে মাঝে তিনি একটু ঘুমাইবার আশায় থাকিতেন। কিন্তু সে উপায়ও কি ছিল! দিনে-রাতে কোন সময়েই কি জেলখানায় স্বস্তি ছিল! বেলা যত বাড়িত, মাছির উৎপাত ততই বাড়িতে থাকিত এবং তাহাদের সঙ্গে আসিয়া যোগ দিত অসংখ্য ছোট ছোট ডাঁশ। এত গরম যে মুখ ঢাকিয়া রাখা যাইত না। অথচ মুখ ঢাকিয়া না রাখিলে মশামাছির আক্রমণ হইতে নিস্তার ছিল না। তাই মাঝে মাঝে বিছানায় শুইয়া তিনি হাত-পাখার বাতাসে মশামাছি তাড়াইয়া নিশ্চিন্তভাবে একটু শুইয়া থাকিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু একটু তন্দ্রা আসিয়া পাখাখানি যেই তাঁহার হাত হইতে খসিয়া

পড়িত, অমনি মাছিদের সাহস বাড়িত। তাহারা তাঁহার মুখের উপর দিব্যি ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মত ছুটাছুটি আরম্ভ করিয়া দিত। অমনি চমকিয়া উঠিয়া তিনি আবার পাখা নাড়িয়া তাহাদিগকে তাড়াইতে সুরু করিতেন।

গরমের দিনে জীবন ত এমনি দুর্বিষহ হইত; বর্ষার দিনেও কি তাই শান্তি ছিল! বৃষ্টি নামিলেই শ্রীযুক্তা পণ্ডিতের ঘরখানির শতছিদ্র ছাদ দিয়া জল চুয়াইয়া পড়িত। ঘরের সমস্ত মেঝেটা তখন ভিজিয়া এমন সপসপে হইয়া যাইত যে বিছানাটা রাখিবার মত একটা শুকনা জায়গা পর্য্যন্ত তখন তিনি খুঁজিয়া পাইতেন না। মুষলধারে বৃষ্টি নামিলে এক একদিন ঘরখানা একটা হ্রদের মত দেখাইত—জলের স্রোত মেঝে দিয়া সেদিন বহিয়া যাইত, আর তাহার মধ্যে শ্রীযুক্তা পণ্ডিতের বিছানাটা একটা দ্বীপের মত শোভা পাইতে থাকিত। একদিন সারারাত বৃষ্টি হইয়াছিল। পরদিন সকালবেলা শ্রীযুক্তা পণ্ডিত দেখিলেন যে তাঁহার বিছানাটার অনেকখানি ভিজিয়া গিয়াছে, ঘরের মধ্যে বসিবার মত একটুও শুকনা জায়গা নাই। রাঁধিবার কাঠগুলা পর্য্যন্ত ভিজিয়া সপসপে হইয়া গিয়াছে।

গরমের দিনে রাত্রে মশার ঐক্যতান গান শোনা যাইত, বর্ষার দিনে সুরু হইত ব্যাঙের কানে-তালা-লাগানো একঘেয়ে ডাক। ব্যাঙ্‌গুলোর ঐক্যতান গানের সুর যখন চড়িতে থাকিত, তখন শ্রীযুক্তা পণ্ডিতের মাথা খারাপ হইয়া যাইবার জোগাড়

হইত। মাঝে মাঝে দুই চারিটা ব্যাঙ্ এই বর্ষাকালে তাঁহার ঘরের মধ্যে আসিয়া নির্ব্বিকারচিত্তে ঘোরাফেরা করিত। একদিন শ্রীযুক্তা পণ্ডিত একটাকে খালিপায়ে মাড়াইয়া ফেলিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্তা পণ্ডিতের ঘরে শুধু যে ব্যাঙেরই গতিবিধি ছিল, তাহা নহে। মশামাছি ও পোকার উপদ্রব ছিল। পিঁপড়ার উপদ্রব এমন ছিল যে, চা তৈয়ারীর জন্য রাখা চিনি তাহাদের হাত হইতে বাঁচান দায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বিড়ালে দুধ খাইয়া যাইত। ইঁদুরে বিড়ালগুলাকে ভয় করিত বলিয়া মনে হয় না। কারণ তাহাদের দাপাদাপিতে শ্রীযুক্তা পণ্ডিত অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন। একদল বাদুড় হামেশা তাঁহার ঘরে আসা-যাওয়া করিত। উইপোকার উপদ্রবও কম ছিল না। একদিন উইপোকারা দল বাঁধিয়া তাঁহার একটা ফলের ঝুড়ি কাটিয়া আধখানা আপেল ও খানিকটা বাতাবি লেবু সাবাড় করিয়া দিয়াছিল। একদিন একটা ছাই রঙের বিষাক্ত সাপকেও তাঁহার ঘরের বাহিরের রেলিঙের উপর তিনি জড়াইয়া স্থির হইয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন।

প্রথম প্রথম জেলখানায় শ্রীযুক্তা পণ্ডিতের দিনগুলি কাটিতে চাহিত না। আর রাতগুলি শ্রীযুক্তা পণ্ডিতের কাছে মনে হইত, যেন অন্য জায়গার রাতের চেয়ে কয়েক ঘণ্টা বড়। সময় সেখানে দীর্ঘতর। প্রত্যেক দিন যেন একটা মাস, প্রত্যেক মাস

যেন একটা বছর। বাস্তবিক কারাবাস করিয়া মানুষ যখন মুক্ত হইয়া বাহিরে আসে, তখন তাহার মনে হয় যে, সে যেন একটা গোটা শতাব্দী কারাপ্রাচীরের অন্তরালে পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ছিল!

শ্রীযুক্তা পণ্ডিত তাঁহার কারাবাসকালে প্রথম প্রথম অলস মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যাবেলাটা কাটাইতেন গরাদেগুলোর ধারে বসিয়া বাহির পানে চাহিয়া। গরাদের মধ্য দিয়া তিনি উদাসদৃষ্টিতে আকাশের পানে চাহিয়া থাকিতেন। আকাশে ভাসমান মেঘ-গুলি দেখিতে তাঁহার কেমন যেন ভাল লাগিত—রাত্রির আকাশে তারাগুলির ঝিকিমিকি দেখিতেও তাঁহার অপরূপ লাগিত।

যেখানটায় তাঁহার বিছানাটা পাতা ছিল, সেখান হইতে কারাগারের সদর দরজাটা দেখা যাইত। বাইরের পৃথিবীর দৃশ্যটাকে আড়াল করিয়া সেই লোহার কপাট ছিল বিরাজমান। কিন্তু মাঝে মাঝে যখন সেই দরজাটি খোলা হইত, তখন বাহিরের জগতের একটুখানি ছবি ঐ দরজার ফাঁক দিয়া তাঁহার চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিত। সবুজ ঘাসের একটু আভাস আর রাস্তার এক টুকরা দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার মন খুসিতে ভরিয়া উঠিত। পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন মানুষ মুহূর্তের জন্য হইলেও, পৃথিবীকে দেখিয়া এমনই আনন্দ সত্য সত্যই পাইয়া থাকে।

কারাগারে সময় কাটাইবার একমাত্র উপায় ছিল বই পড়া। শ্রীযুক্তা পণ্ডিত সেজন্য অনেক বই-ই পড়িতেন। এ ছাড়া, তিনি তাঁহার ঘরের সামনের ছোট্ট উঠানটিতে সময় কাটানর জন্য একটি বাগান করিতেন। জায়গাটা ছোট্ট হইলেও সেখানে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই একটি সুন্দর ছবির মত বাগান গড়িয়া উঠিয়াছিল। সেখানে যে-সব ফুল ফুটিত, সে-সব ফুল অসাধারণ এমন কিছু নয়—তবু সেগুলি ফুল। শুধুমাত্র ঐ ক'টি ফুলের দরুণ জেলখানার বিশ্রী পরিবেশটা শ্রীযুক্তা পণ্ডিতের বড় মধুর বলিয়া মনে হইত—ফুলগাছগুলির মুখোমুখি দাঁড়াইলে মনটা খুশিতে ভরিয়া যাইত। কারাজীবনে এই খুশিটুকুর মূল্য কম নহে।

আলিপুরে ও আন্দামানে

—উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলার স্বদেশী যুগের কথা।

বাংলায় সে একটা অপূর্ব্ব যুগই আসিয়াছিল। আশার রঙীন নেশায় বাঙ্গালী ছেলেরা তখন ভরপূর। তখন ইংরাজের তোপ বারুদ, গোলাগুলি পল্টন মেশিনগান এসবকে তাহারা ভয় করিত না। ভাবিত, ইংরাজের রাজ্য—সে ত তাসের ঘর। এক ফুৎকারেই উড়িয়া যাইবে। সে এমন একটা যুগ, যখন দেখা গিয়াছিল—"লক্ষ পরাণে শঙ্কা না জানে, না রাখে কাহারো ঋণ।" দেশের প্রতি ভালবাসায় বাঙ্গালীর ঘুমন্ত প্রাণ তখন সজাগ হইয়া উঠিয়াছে। কোন্ অজানা দেশের আলোক আসিয়া বাঙ্গালীর মনের যুগযুগান্তরের আঁধার যেন মুছিয়া দিয়াছে। "জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন" করিয়া বাংলার ছেলেরা তখন দেশের কাজে মাতিয়া উঠিয়াছে।

ঐ সময়ে কিংসফোর্ড সাহেবকে হত্যা করার জন্য মজঃফর-পুরে বোমা ফাটিল। সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় সুরু হইল ব্যাপক ধরপাকড়। কলিকাতার মাণিকতলায় শ্রীঅরবিন্দের ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষের একটি বাগান ছিল। সেই বাগানে দেশ-প্রেমিক একদল তরুণ যুবক আড্ডা লইয়াছিল। সেখানে তাহারা বোমা তৈয়ারী করিত, বন্দুক-রিভলভার ছুঁড়িতে শিখিত। ঐ জায়গাটাই ছিল তাহাদের গোপন কুচ্‌কাওয়াজের কেন্দ্র, তাহাদের দুর্গ, তাহাদের সাধনা ও অনুপ্রেরণার ক্ষেত্র—তাহাদের সব কিছু। সুতরাং ঐ বাগান পুলিশের নজর এড়াইল না। তাহারা আসিয়া সেখানকার তরুণদলকে গ্রেফ্‌তার করিয়া জেলের হাজতে লইয়া গেল। এই দলে ছিলেন উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলার জাগ্রত-যৌবনকে যাঁহারা অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ইনি একজন।

গ্রেফ্‌তার করার পর উপেন্দ্রনাথকে জেলের যে কুঠরীর মধ্যে রাখা হইল তাহা সাত হাত লম্বা, পাঁচ হাত চওড়া। সেই কুঠরীর মধ্যে উপেন্দ্রনাথ ভিন্ন আরও দুইজন রাজনৈতিক কয়েদী ছিলেন। কুঠরীর সামনে ছোট্ট একটি বারান্দা। সেইখানে হাতমুখ ধুইবার ও স্নানাহার সারিবার ব্যবস্থা। বারান্দার সামনে সরু লম্বা উঠান। তাহার পরেই উঁচু পাঁচিল। পাঁচিলটা ছিল এই সকল তরুণ ছেলেদের চক্ষুশূল। সেটা যেন অহরহঃ চীৎকার করিয়া ক্রমাগত উহাদিগকে মনে করাইয়া দিত যে তাহারা কয়েদী।

প্রাচীরের উপর দিয়া খানিকটা আকাশ ও একটা অশ্বত্থ গাছের মাথা দেখা যাইত। জেলখানার কবিত্ব কেবল ঐটুকু লইয়াই। সেখানকার বাকি সবটাই নিরেট গদ্য। আর সব-চেয়ে নীরস সেখানকার আহারটা। প্রথম দিন উহা দেখিয়া উপেন্দ্রনাথের হাসি পাইল, দ্বিতীয় দিন রাগ ধরিল, তৃতীয় দিন কান্না আসিল।

যেদিন জেলে তাঁহাদিগকে লইয়া যাওয়া হইল, তাহার পরদিনই সকালবেলা ঘুম হইতে উঠিতে না উঠিতেই একটা প্রকাণ্ড কালো জোয়ান লোক বালতি হইতে সাদা সাদা কি খানিকটা তাঁহাদের লোহার থালার উপর ঢালিয়া দিয়া গেল। উহা লফসি। সকালবেলাকার জলখাবার। লফসি জিনিসটা যে কি তাহা এই সব ছেলেরা কোন দিনও জানিত না। জেলখানাতেই ঐ জিনিসটির জন্ম, সেখানেই উহা সীমাবদ্ধ। তাই উপেন্দ্রনাথ খাবারটার নাম লফসি শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "লফসি! সে আবার কোন্ জাতের খাবার!" পরমুহূর্ত্তেই একজন ছেলে উহা একটু পরীক্ষা করিয়া বলিল, "ওহো! এ যে দেখছি ফেন-মিশান ভাত!"

পরদিন ঐ লফসির বর্ণ-পরিবর্ত্তন হইল। ডালের সহিত মিশিয়া সেদিন উহা পীতবর্ণ ধরিয়াছিল। তৃতীয় দিন পুনরায় উহার বর্ণ-পরিবর্ত্তন দেখা গেল। সেদিন উহার রং হইয়াছিল রক্তবর্ণ। শুনা গেল ফেন-মিশান ভাতের মধ্যে গুড় দেওয়া

হইয়াছে। উহাই নাকি জেলখানার প্রাতরাশের রাজ-সংস্করণ,—রাজভোগ আর কি!

সাড়ে দশটার সময়ে একটা টিনের বাটির একবাটি রেঙ্গুন চালের ভাত, খানিকটা অড়হর কিংবা খানিকটা পাতা ও ডাঁটা সিদ্ধ এবং একটু তেঁতুল-গোলা। সন্ধ্যার আহারও সেইরূপ—তবে উপাদেয় তেঁতুল-গোলাটা থাকিত না।

প্রথম দিন জেলের ডাক্তার ও জেলার বাবু এই সব বোমার মামলার ছেলেদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেই, খাবার সম্বন্ধে ছেলেরা প্রতিবাদ সুরু করিয়া দিল। ডাক্তারটি জাতিতে আইরিশ, বড় নিরীহ। তিনি ছেলেদের খাওয়ার কষ্ট শুনিয়া বলিলেন, "উপায় নাই। জেলের কয়েদীদের খাওয়া-দাওয়া একেবারে সরকারের হিসাব মত ধরাবাঁধা। তাহার এতটুকু অদল-বদল করার উপায় নাই। তবে কাহারও অসুখ-বিসুখ করিলে তিনি হাসপাতালের খাবার তাহার জন্য পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন। সে খাবার অনেক ভাল। কিন্তু সুস্থ অবস্থায় সে খাবার তিনি ছেলেদের পাঠাইতে অক্ষম।"

জেলার বাবু বলিলেন, "জেলের বাগানে আলু, বেগুন, কুমড়া, পেঁয়াজ প্রভৃতি সব তরি-তরকারিই ত হয়; এত সব্জী এখানে জন্মিতেছে, তবু তোমাদের খাবার তোমরা পাও না,—একথা আমি মানিতে রাজি নহি।" ছেলেদের দলের মধ্যে শচীন নামে একটি ঠোঁটকাটা ছেলে ছিল। সে চট করিয়া উত্তর

দিল—"বাগানে ত সবই হয়, কিন্তু পুঁই-ডাঁটা আর হিঁচোড়ের খোসা ছাড়া বাকি সবই বোধ হয় রাস্তা ভুলিয়া অন্য কোথাও চলিয়া যায়?"

যাহা হউক, জেলখানার ডাক্তার সাহেবের কথা শুনিয়া আশার একটা ক্ষীণ আলো উপেন্দ্রনাথ প্রভৃতি দেখিতে পাইলেন। জেলখানার যাচ্ছেতাই আহারের হাত হইতে রেহাই পাইবার জন্য মাঝে মাঝে সকলকার অসুখ করিতে লাগিল। কিন্তু নিত্য নূতন অসুখই বা কোথায় খুঁজিয়া পাওয়া যায়? তাই প্রথম প্রথম বেশ চলিল। পরে ছেলেদের বড় মুস্কিল হইতে লাগিল। পেট কামড়ান, মাথা ধরা, বুক দুর দুর করা, গা বমি বমি করা,—সবই যখন একে একে ফুরাইয়া গেল, তখন বাহিরে প্রকাশ পায় না এমন অসুখ আবিষ্কারের জন্য ছেলেদের মাথা ঘামিয়া উঠিল। রোগ একটা দরকার ছিলই; নহিলে প্রাণ বাঁচানর উপায় ছিল না। তাই একদিন উপেন্দ্রনাথদের দলেরই একজন রোগ খুঁজিয়া না পাইয়া ডাক্তারকে গম্ভীরভাবে জানাইলেন যে, তাঁহার বামচক্ষুর উপরের পাতা তিনদিন ধরিয়া সমানে নাচিতেছে, সুতরাং তিনি যে কঠিন পীড়াগ্রস্ত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। হাসপাতালের অন্ন ভিন্ন তাঁহার আর বাঁচিবার উপায় নাই। তাঁহার কথা শুনিয়া ডাক্তার সাহেব প্রথম খানিকটা হাসিয়া লইলেন। পরে হাসপাতালের অন্নের ব্যবস্থাই তাহার জন্য তিনি করিয়া গেলেন।

পয়সা থাকিলে যে জেলখানায় বসিয়া বসিয়াই সবকিছু পাওয়া যাইতে পারে, এ জিনিসটা উপেন্দ্রনাথ কারাগারে আসার দু-একদিনের মধ্যেই আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। জেলের প্রহরী ও পাচকের হাতে যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিতে পারিলে ভাতের ভিতর হইতে কৈ-মাছ ভাজা, রুটির গাদার মধ্য হইতে আলু পেঁয়াজের তরকারি বাহির হইয়া আসিত; এমন কি পাহারাওয়ালার গাড়ীর ভিতর হইতে পান ও চুরুট বাহির হইতেও উপেন্দ্রনাথ দেখিয়াছিলেন।

তবে জেলখানার মস্ত একটা অসুবিধা,—এক কুঠরীর লোকের সহিত আর এক কুঠরীর লোকের কথা কহিবার হুকুম ছিল না। উপেন্দ্রনাথ প্রভৃতি প্রথমে লুকাইয়া লুকাইয়া একটা আধটা কথাবার্ত্তা বলিতেন। কিন্তু উহা জানিতে পারার সঙ্গে সঙ্গে পাহারাওয়ালাদের মহা আপত্তি উঠিত। তাহারা ভয় দেখাইত, —জেলারের কাছে নালিশ করিব। কিন্তু হঠাৎ একদিন দেখা গেল যে, পাহারাওয়ালারা বেশ শান্তশিষ্ট হইয়া গিয়াছে। উপেন্দ্রনাথ প্রভৃতিরা চীৎকার করিয়া কথা কহিলেও তাহারা আর শুনিতে পায় না। অনুসন্ধানে উপেন্দ্রনাথ জানিয়াছিলেন যে, তাঁহাদেরই এক বন্ধু কয়েকটি রৌপ্যখণ্ড দিয়া পাহারাওয়ালাদে কানের ছিদ্র বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। তাই কথা বলিলে তাহারা শুনিয়াও শুনিত না, এমন কি জেলার বা জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ আসিতেছেন দেখিলে তাহারা আসিয়া উপেন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে

সাবধান করিয়া দিয়া যাইত। টাকার অনন্ত মহিমা উপেন্দ্রনাথ কানে শুনিয়াছিলেন, জেলে গিয়া তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তিনি পাইয়াছিলেন।

জেলে গিয়া প্রথম প্রথম উপেন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে ছোট কুঠরীর মধ্যেই থাকিতে হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমশঃ বোমার আসামী হিসাবে পুলিশ এত যুবক ধরিয়া আনিয়া জেলে পূরিতে লাগিল যে, কুঠরীতে আর তাঁহাদের কুলাইতেছিল না। তখন বেশ একটা সুপরিসর ওয়ার্ডে তাঁহাদিগকে রাখা হইল। তখন সকলের বিষণ্ণতা দূর হইল। নাচিয়া গাহিয়া, হাসি-ঠাট্টা-তামাসা করিয়া তাঁহাদের দিন বড় আনন্দেই কাটিয়া যাইতে লাগিল। উপেন্দ্রনাথ প্রভৃতিরা যে তাঁহাদের বাড়ীঘর ছাড়িয়া জেলে আসিয়াছেন, হট্টগোলের মধ্যে তাহা মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহাদের মনে হইত না। সন্ধ্যার সময়ে তাঁহাদের গানের আড্ডা বসিত এবং স্বদেশী গান গাওয়া হইত। পাশে দুইটি ছোট ছোট ঘর ছিল। সেখানে লেখাপড়া এবং ধর্ম্মালোচনাও হইত।

জেলের আহারের সম্বন্ধে উপেন্দ্রনাথের দল ক্রমাগত অভিযোগ করায় সেখানকার ডাক্তার তাঁহাদের জন্য বাহির হইতে ফলমূল বা মিষ্টান্ন পাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। কলিকাতায় তখন 'অনুশীলন সমিতি' নামে একটি আখড়া ছিল। তাহারাও মাঝে মাঝে ঘি, চাল, মসলা ও

মাংস পাঠাইয়া দিত। যেদিন এই সব জিনিস আসিত, সেদিন জেলখানার মধ্যেই যেন একটা রাজসূয় যজ্ঞ বসিয়া যাইত। ছেলেরা পোলাও বানাইয়া পরিতৃপ্তির সহিত খাইত।

বাহির হইতে খাবার আনয়ন করার কোন বিধি-নিষেধ ছিল না বলিয়া, এই সকল বোমার মামলার যুবকদের জন্য সব রকম খাবারই আসিয়া জুটিয়া যাইত। আম কাঁঠাল এত অধিক আসিত যে, খাইয়া তাহা শেষ করা দায় হইত। তাই মাঝে মাঝে আম কাঁঠালের রস লইয়া পরস্পর পরস্পরের গায়ে মাখাইয়া দিয়া আম কাঁঠালের সদ্ব্যবহার করা হইত।

রবিবার এই বোমার মামলার যুবকদের স্ফূর্ত্তির মাত্রা বেশ একটু বাড়িয়া যাইত। কারণ সেই দিন আত্মীয়-স্বজন ও বাহিরের অনেক লোক তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেন। সুতরাং বাহিরের জগতের খবর তাঁহাদের কাছ হইতে পাওয়া যাইত। মিষ্টান্নও যথেষ্ট পরিমাণে মিলিত। বিপুল হাস্যরসের মধ্যে মাঝে মাঝে করুণ ভাবও ঐদিন দেখা দিত। একদিন কোন একটি যুবকের পিতা ছেলের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। তিনি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিলেন—জেলে কি রকম খাবার দেওয়া হয়। উত্তরে ছেলে বলিল,—লফসি। কিন্তু পাছে লফসির স্বরূপ প্রকাশ পাইয়া পিতার মনে কষ্ট হয়, সেই ভয়ে ছেলেটি লফসির গুণ বর্ণনা করিয়া বলিল—

"লফসি খুব পুষ্টিকর জিনিস।" ছেলের কথা শুনিয়া পিতার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল।

আর একদিন—সেদিন উপেন্দ্রনাথের আত্মীয়-স্বজনেরা তাঁহার ছেলেকে তাঁহার সহিত দেখা করাইতে লইয়া আসিয়াছিলেন। ছেলেটির বয়স দেড় বৎসর, কথা কহিতে পারে না। হয়ত তাহার সহিত এ জন্মে আর দেখা হইবে না ভাবিয়া তাহাকে কোলে লইবার একবার বড় সাধ হইয়াছিল। কিন্তু মাঝের লোহার রেলিংগুলা উপেন্দ্রনাথের সে সাধ মিটাইতে দেয় নাই।

এইরূপে সুখেদুঃখে জেলখানায় উপেন্দ্রনাথ প্রভৃতি বোমার মামলার যুবকদলের দিন কাটিতেছিল। ইতিমধ্যে ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে তাঁহাদের বিচার আরম্ভ হইল। প্রতিদিন উপেন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে আদালতে লইয়া যাওয়া হইত—আদালতে কতরকম জেরা তাঁহাদের করা হইত, কিন্তু সে সবের প্রতি ইঁহাদের ভ্রূক্ষেপই ছিল না। স্কুলের ছুটির পর ছেলেরা যেমন মহা-স্ফূর্ত্তিতে বাড়ী ফিরিয়া আসে, এই বোমার মামলার যুবকদলও আদালত ভাঙ্গিবার পর তেমনি গান গাহিতে গাহিতে, চীৎকার করিতে করিতে গাড়ী চড়িয়া জেলে ফিরিয়া আসিতেন। তাহার পর সন্ধ্যার সময়ে যখন ইঁহাদের সভা বসিত তখন, বার্লি সাহেব কি রকম ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় সাক্ষীদের জেরা করেন, নর্টন সাহেবের প্যাণ্টালুনটা কেমন তালি লাগান, কোর্ট-ইন্‌স্পেক্টরের গোঁফজোড়া এমন কেন—নিশ্চয়ই ইঁদুরে খাইয়াছে,

কি আর্শুলায় খাইয়াছে—এই সকল বিষয় লইয়া মহা গবেষণা আরম্ভ হইয়া যাইত। ইহাতে যুবকেরা প্রাণ ভরিয়া হাসিতেন।

ইতিমধ্যে আলিপুর জেলে একটা হত্যাকাণ্ড হইয়া গেল। নরেন গোঁসাই নামে এক যুবক বোমার মামলার আসামী হিসাবেই ধরা পড়িয়া আলিপুরে আসিয়াছিল। সে উপেন্দ্রনাথ প্রভৃতিদের সঙ্গে জেলখানায় একসঙ্গেই থাকিত। মামলা আরম্ভ হওয়ার দুই চারিদিন পরেই সে সরকারী সাক্ষীরূপে কাঠগড়ায় দেখা দিল। তখন বোমার মামলায় জড়িত সকল যুবকই বুঝিলেন যে, নরেন্দ্র তাঁহাদের সহিত মিশিয়া যে সব খবর জানিয়া লইয়াছে, সমস্তই সে একে একে প্রকাশ করিয়া দিতেছে। নরেন্দ্রের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ লওয়ার জন্য কানাইলাল কি করিয়া যেন একটা রিভলভার যোগাড় করিয়া একদিন নরেন্দ্র গোস্বামীকে গুলি করিয়া হত্যা করিল। জেলখানার মধ্যে মহা হৈচৈ পড়িয়া গেল।

নরেনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বোমার মামলার যুবকদের অদৃষ্ট পুড়িল। তাহাদের বিছানা, বালিশ প্রভৃতির তল্লাসী হইতে লাগিল। কোথাও আরও রিভলভার লুকান আছে কি না পুলিশ তাহা খুঁজিয়া দেখিতে লাগিল। কিন্তু উহারা কিছুই পাইল না। কেবল দুই-চারিটা টাকা—যাহা বিছানা বা বালিশের মধ্যে লুকান ছিল, পাহারাদারেরা তাহা পাইয়া নির্বিচারে উহা হজম করিতে লাগিল।

সন্ধ্যার সময়ে জেলার বাবু যুবকদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। ভদ্রলোকের মুখ একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন, "মশাই, এতই যদি আপনাদের মনে ছিল ত' জেলের বাইরে কাজটা সারলেই ত' ভাল হ'ত। আপনারা ত' দেখছি মরিয়া, তবে ধরা পড়তে গেলেন কেন?" এ কথায় উপেন্দ্রনাথ প্রভৃতি যুবকেরা সমস্বরে প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে, তাঁহারা এ ব্যাপারের সঙ্গে আদৌ সংশ্লিষ্ট নহেন। কিন্তু জেলার বাবু সেটা বিশ্বাস করিলেন না। তিনি অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ, তা ত' বুঝতেই পারছি। যাই হোক, আপনাদের যা হবার তা হবে; এখন আমার দফা রফা হয়ে গেল।" অর্থাৎ, জেলখানায় একটা রিভলভার ঢুকিল, তাহার দ্বারা সরকারী সাক্ষী বিশেষ পাহারায় থাকা সত্ত্বেও খুন হইয়া গেল, অথচ জেলার তাহা নিবারণ করিতে পরিলেন না বলিয়া, তিনি সেখান হইতে বদলী হইলেন।

ইহার পর এই সকল রাজনৈতিক কয়েদীদের সম্পর্কে কড়াকড়ি বাড়িল। যে স্বাধীনতা তাহাদের ছিল, সে সমস্তই কাড়িয়া লওয়া হইল। তাহাদিগকে সব এক জায়গায় আর না রাখিয়া জেলের মধ্যে নির্জ্জন কারাবাসে পোরা হইল। খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধা হইলেই এই সকল কয়েদীরা অসুখ না করিলেও অসুখের ছুতা করিয়া হাসপাতালে যাইতে পারিত। সে সুবিধাটিও গেল। এখন হইতে ইহাদিগকে

অসুখ হইলেও সেই জেলের মধ্যে পড়িয়া থাকিতে হইত। কাহারও সহিত কাহারও কথা বলিবার উপায় রহিল না। জেল-কর্ত্তৃপক্ষ ভাবিলেন যে, একবার সকলকে মেলামেশা করিতে দেওয়ায় জেলখানায় রিভলভার ঢুকিল, তাহার গুলিতে একজনের প্রাণও গেল। আবার উহাদিগকে এক জায়গায় রাখিলে না জানি কি অনর্থ ঘটিবে! হয়ত বোমা দিয়া উহারা জেলখানার দেয়ালটাই উড়াইয়া দিয়া একদিন পলাইয়া যাইবে। শত প্রহরী থাকা সত্ত্বেও যাহারা রিভলভার আনিয়া জেলে ঢুকাইতে পারে, তাহাদের অসাধ্য কি!

ক্রমে দেশী প্রহরীর বদলে ইউরোপীয় প্রহরী আসিল, আর দিনের বেলা ও রাত্রিবেলা দুইদল গোরা সৈন্য আসিয়া জেলের ভিতরে ও বাহিরে পাহারা দিতে আরম্ভ করিল।

সারাদিন কাহারও সহিত কথা বলিবার উপায় রহিল না। সমস্ত দিন চুপ করিয়া থাকায় এই সব রাজনৈতিক কয়েদীদের জীবন হাঁফাইয়া উঠিত। সকালে ও বিকালে ইঁহারা আধঘণ্টা করিয়া উঠানের মধ্যে ঘুরিতে পারিতেন। কিন্তু সকলকেই পরস্পরের কাছ হইতে দূরে দূরে থাকিতে হইত। প্রহরীদের চোখ এড়াইয়া কথা কহিবার সুবিধা ছিল না।

নিঃসঙ্গ নির্জ্জন জীবনে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়া একদিন উপেন্দ্রনাথ নূতন জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট হইতে পড়িবার জন্য বই চাহিলেন। কিন্তু তিনি দুঃখের সহিত জানাইলেন যে,

গভর্ণমেণ্টের অনুমতি ছাড়া তাঁহাদের সম্বন্ধে কিছুই তিনি করিতে পারেন না। নরেনের মৃত্যুর পর হইতে তাঁহার হাত হইতে সকল ক্ষমতাই কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে।

নরেন্দ্র গোস্বামীর হত্যার ব্যাপারে কানাইলাল ও সত্যেন্দ্রনাথ জড়িত ছিলেন। রাজসাক্ষী হইতে হইলে কি করিতে হইবে একথা জানিতে চাহিয়া জেলের হাসপাতাল হইতে সত্যেন্দ্রনাথ নরেন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠান। নরেন্দ্র এই আহ্বানে বিপদের কোনরূপ আশঙ্কা না করিয়া সেখানে যান এবং তাহার পরই তাঁহাকে কানাইলালের হাতে রিভলভারের গুলিতে প্রাণ হারাইতে হয়। সুতরাং সত্যেন্দ্রনাথ আর কানাইলালকে কড়া পাহারায় ছু'টি পৃথক সেলে রাখা হইয়াছিল। বোমার মামলার সকল কয়েদীকে সেলে রাখা হইলেও তাহারা একবার করিয়া অন্ততঃ জেলখানার উঠানে সকালে-বিকালে বাহির হইতে পারিতেন। কিন্তু কানাইলাল ও সত্যেন্দ্রনাথের সেলের দরজা সদাসর্ব্বদাই বন্ধ থাকিত।

কিন্তু একদিন দেখা গেল কানাইলালের দরজা খোলা। তাহার দরজা খোলা দেখিয়া রাজনৈতিক বন্দীরা সেদিকে গেল, প্রহরীও কোন বাধা দিল না। পরে তাঁহারা শুনিলেন যে কানাইলালের ফাঁসীর হুকুম হইয়াছে, তাহার ফাঁসীর দিনও ঠিক হইয়া গিয়াছে। তাই প্রহরীরা তাহার সহিত সকলকে দেখা করিতে বাধা দিল না।

উপেন্দ্রনাথ প্রভৃতি রাজনৈতিক বন্দীরা ধীরে ধীরে কানাইলালের কুঠরীতে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া তাঁহারা যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহারা আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। তাঁহার প্রশান্ত মুখচ্ছবি সকলকে অবাক করিয়া দিল। তাঁহার মুখে চিন্তার রেখা নাই, বিষাদের ছায়া নাই, চঞ্চলতার লেশমাত্র নাই—প্রফুল্ল কমলের মত তাহা যেন আপনার আনন্দে আপনি ফুটিয়া রহিয়াছে। জীবন ও মৃত্যু তাঁহার কাছে সেদিন সমান বলিয়াই মনে হইয়াছিল, তাই তাঁহার মুখে সেদিন ঐ প্রশান্ত ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। উপেন্দ্রনাথ প্রভৃতিরা কানাইলালের প্রহরীর কাছে শুনিলেন যে, ফাঁসীর আদেশ পাইয়া তাঁহার ওজন ষোল পাউণ্ড বাড়িয়া গিয়াছে।

তাহার পর একদিন প্রভাতে কানাইলালের ফাঁসী হইয়া গেল। আত্মাহুতি দিয়া সে দেশের তরুণদলের সামনে এক উজ্জ্বল আদর্শ রাখিয়া গেল।

অতঃপর বিচার শেষ হইয়া গেল—রায়ও বাহির হইল। পনের ষোল জন ভিন্ন, সকলেই ছাড়া পাইলেন। যাঁহারা ছাড়া পাইলেন না, তাঁহাদিগের কাহারও কাহারও হইল মেয়াদী কারাদণ্ড, কাহারও বা যাবজ্জীবনের দ্বীপান্তর। উপেন্দ্রনাথ ছাড়া পান নাই, তাঁহার যাবজ্জীবন কারাবাস হইল।

যাঁহারা ছাড়া পাইয়াছিলেন, হাসিতে হাসিতে উপেন্দ্রনাথেরা তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন। কিন্তু সে হাসির তলায় একটা

যেন বুকফাটা কান্না জমাট হইয়া উঠিতেছিল। বাকি জীবনটা জেলখানাতেই কাটাইয়া দিতে হইবে, এই কল্পনায় উপেন্দ্রনাথ প্রথমটায় মনে মনে একটু অধীর হইয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমশঃ যাবজ্জীবন দীপান্তরের চিন্তা গা-সহা হইয়া আসিয়াছিল।

রায় বাহির হইবার দেড় মাসের মধ্যেই উপেন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে আন্দামানে পাঠান হইল।

কারাগার হইতে একবার দেশকে দেখিয়া লইলেন—কি জানি কোনদিন আবার দেশে ফিরিবেন কি না কে জানে! হাতে হাতকড়ি লাগাইয়া তাঁহাদিগকে গাড়ীতে চড়ান হইল। দুইপাশে দুইজন সার্জেণ্ট বসিল; গাড়ী খিদিরপুরের ডকের দিকে ছুটিল।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে আন্দামানের জাহাজ ছাড়িয়া দিল। জাহাজের খোলের মধ্যে একটা কামরায় উপেন্দ্রনাথ ও আর একজন রাজনৈতিক কয়েদীকে পূরিয়া দেওয়া হইল।

তিন দিন তিন রাত জাহাজে কাটাইয়া তাঁহারা পোর্টব্লেয়ারে পৌঁছিলেন। দূর হইতে জায়গাটি বড়ই রমণীয় বলিয়া মনে হইল। সারি সারি নারিকেল গাছ, আর তাহার মাঝে মাঝে সাহেবদের বাংলোগুলি যেন ফ্রেমে বাঁধান ছবির মত। ভিতরে যে কি নির্ম্মম নিষ্পেষণ সেখানে হইত তাহার কথা তখনও তাঁহারা জানিতেন না।

দূরে একটি প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়ী দেখাইয়া একজন সিপাহী বলিল,—"ঐ কালাপানির জেল, ঐখানে তোমাদের থাকিতে হইবে।"

জাহাজ গিয়া বন্দরে লাগিল। তাহার পর ডাঙ্গায় নামিয়া উপেন্দ্রনাথ ও তাঁহার সঙ্গী নিজেদের বিছানার পুঁটুলিটা মাথায় করিয়া, বেড়ি বাজাইতে বাজাইতে জেলের দিকে রওনা হইলেন।

জেলের মধ্যে ঢুকিবামাত্র একজন মোটাসোটা বেঁটে ইংরাজ তাঁহাদের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন,—"ঐ যে দেখছো···ঐ বাড়ীটা, ঐখানে আমরা সিংহদের পোষ মানাই। ওখানে তোমাদের দলের অনেক শর্ম্মাকেই দেখতে পাবে। কিন্তু খবরদার। কথা বলো না।"

উপেন্দ্রনাথও শ্বেতাঙ্গটিকে একবার চক্ষু দিয়া মাপিয়া লইলেন। লম্বায় পাঁচ ফুট, আর চওড়ায় প্রায় তিন ফুট। মোট কথা, একটি প্রকাণ্ড কোলা বাঙ্‌কে কোট-প্যাণ্টালুন পরাইয়া, টুপি পরাইয়া দিলে যেমন দেখায়, ইহাকে দেখিতে অনেকটা সেই রকমই ছিল। ইনিই জেলের হর্ত্তা-কর্ত্তা বিধাতা। ভগবান যেন ইঁহাকে নির্জ্জনে বসিয়া ঐ কালাপানির জেলে কর্ত্তৃত্ব করিবার জন্যই গড়িয়াছিলেন।

আন্দামানের জেলে পৌঁছিতেই উপেন্দ্রনাথের পৈতা কাড়িয়া লওয়া হইল। দেশের জেলে ঐরূপ কোন নিয়ম ছিল না সত্য। কিন্তু আন্দামানে ঐ নিয়মই বলবৎ। জেল জগন্নাথ-ক্ষেত্র, সেখানে জাতিভেদ প্রথা মরিয়া প্রেতদশা লাভ করিয়াছে।

জেলে ঢুকিলেই প্রথমে নজরে পড়ে নানা জাতির সমাবেশ। বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবী, পাঠান, সিন্ধী, বর্ম্মী, মাদ্রাজী—সকল জাতির লোকই আন্দামানের জেলে।

ভারতবর্ষের কারাগারে যেমন কয়েদীদের ভাল করিয়া তুলিবার কোন চেষ্টা দেখা যায় না, আন্দামানেও তদ্রূপ। অসচ্চরিত্র লোকদিগকে সচ্চরিত্র করিয়া তোলাতেই যে জেলখানার সার্থকতা, সে ধারণা সেখানকার জেল-কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে আদৌ ছিল বলিয়া মনে হয় না। কয়েদী জেল-কর্ত্তৃপক্ষের কাছে কাজ করিবার যন্ত্র বিশেষ, আর যে অফিসার কয়েদী ঠেঙ্গাইয়া যত বেশী কাজ আদায় করিতে পারে, সে তত কাজের লোক, আর তাহার পদোন্নতি তত দ্রুত।

আন্দামানের জেলে সব রকম অপরাধের জন্য দণ্ডিত কয়েদীই প্রায় এক রকম ব্যবহার পাইত। যখন নারিকেল ছোবড়া হইতে দড়ি তৈয়ারী করান হইত, তখন সকলকেই ছোবড়া কুটিতে বসাইয়া দেওয়া হইত। যখন নারিকেল বা সরিষার তেল প্রয়োজন হইত, তখন একটু মোটাসোটা সকলকে ধরিয়াই ঘানিতে জুড়িয়া দেওয়া হইত।

আন্দামানের কয়েদীদের পরস্পর কথা বলার উপায় ছিল না। আহারের ব্যবস্থা দেখিলে চোখ ফাটিয়া জল আসিতে চাহিত। রেঙ্গুন চালের ভাত, মোটা মোটা রুটি—এ সকল

একরকম চলিত। কিন্তু কচুর গোড়া, ডাঁটা ও পাতা, চুপড়ি আলু, খোসা-সমেত কাঁচাকলা ও পুঁইশাক; ছোট কাঁকর প্রভৃতি আবর্জ্জনা একসঙ্গে সিদ্ধ করিয়া যে পরম উপাদেয় ভোজ্য প্রস্তুত হইত, তাহা গলাধঃকরণ করিতে গেলে কান্না আসিত।

সেখানে কাজ-কর্ম্মের ব্যবস্থাও বেশ চমৎকার। কালাপানিতে প্রচুর পরিমাণে নারিকেল জন্মায়। সেগুলি সবই সরকারী সম্পত্তি। সেইজন্য সেখানে প্রধানতঃ নারিকেল লইয়াই কারবার। নারিকেলের ছোবড়া পিটিয়া তাহার সাহায্যে দড়ি তৈয়ারী করা, শুকনা সরিষা ও নারিকেল ঘানিতে পিষিয়া তেল তৈয়ারী করা, নারিকেলের মালা হইতে হুঁকার খোল তৈয়ারী করা—এই সমস্তই কালাপানির জেলখানার প্রধান কাজ। ইহা ভিন্ন সেখানে বেতের কারখানাও ছিল। তবে সাধারণত ছোট ছোট ছেলেরা সেখানে কাজ করিত।

কালাপানির জেলে ছোবড়া পেটাই সবচেয়ে কঠিন কাজ। সকালবেলা উঠিয়াই চাউলের গুঁড়া সিদ্ধ 'কঞ্জি' খানিকটা গলাধঃকরণ করিয়া কয়েদীরা ছোবড়া পিটিতে বসিয়া যাইত। প্রত্যেককে বিশটি নারিকেলের শুকনা ছোবড়া দেওয়া হইত। একখণ্ড কাঠের উপর এক-একটি ছোবড়া রাখিয়া একটি কাঠের মুগুর দিয়া তাহা পিটিতে পিটিতে ছোবড়াটি নরম হইয়া আসিত। তার পর উহাদের উপরকার খোসা উঠাইয়া

ফেলিয়া সেইগুলি জলে ভিজাইয়া পুনরায় পিটিতে হয়। পিটিতে পিটিতে ভিতরকার ভূষি ঝরিয়া গিয়া কেবলমাত্র তার-গুলিই অবশিষ্ট থাকে। এই তারগুলি রৌদ্রে শুকাইয়া পরিষ্কার করিয়া প্রত্যহ এক সেরের একটি গোছা তৈয়ারী করিতে হয়।

ছোবড়া পেটা জিনিসটা প্রথম দিন বেশ করিয়া বুঝিয়া লইয়া যখন উপেন্দ্রনাথ নিজের হাতে ছোবড়া পিটাইতে সুরু করিলেন, তখন দেখিলেন যে তাঁহার হাতময় ফোস্কা পড়িয়া গিয়াছে। সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া কোনরকমে তিনি মাত্র আধ পোয়া আঁশ বাহির করিয়াছিলেন। তারপর যখন বেলা তিনটার সময় তিনি তাঁহার কাজ দাখিল করিলেন, তখন দাঁত-খিঁচুনী এবং গালাগালির বহর শুনিয়া তাঁহার চক্ষুস্থির হইয়া গেল। বিদেশের সেই শত্রুপুরীর মধ্যে কঠোর পরিশ্রম ও গালাগালি সম্বল করিয়া দীর্ঘজীবন কাটাইতে হইবে ইহা ভাবিয়া যেন তাঁহার প্রাণটা হাঁফাইয়া উঠিতে লাগিল।

কিন্তু উপায় ছিল না। ছোবড়া পিটিয়া, কচু পাতার তরকারী আর গালাগালি খাইয়া দিন কাটাইতে হইতেছিল।

ছোবড়া পেটা যেমন যন্ত্রণাদায়ক, ঘানি ঘুরাইয়া নারিকেল বা সরিষার তেল বাহির করাও তেমনি কষ্টকর ছিল। যখন নারিকেল অথবা সরিষা হইতে তেল বাহির করার ভার পড়িত, তখন এক-একজন কয়েদীকে দৈনিক দশ পাউণ্ড

সরিষার তেল বা ত্রিশ পাউণ্ড নারিকেল তেল তৈয়ারী করিতে হইত। কাজটা বড় সোজা নয়। মোটা মোটা পালোয়ান লোকেরাও ঘানি ঘুরাইতে হিমসিম খাইয়া যাইত।

যে-সব রাজনৈতিক বন্দী আন্দামানে ছিলেন, তাঁহাদিগকেও ঘানি টানিতে হইত। উপেন্দ্রনাথ যেদিন ঘানি ঘুরাইতে গেলেন, সেদিন আট-দশ মিনিটের মধ্যেই দম বাহির হইয়া জিভ শুকাইতে আরম্ভ হইল। এক ঘণ্টার মধ্যেই গা-হাত-পা যেন আড়ষ্ট হইয়া গেল। একবার তাঁহার মনে হইল ডাক ছাড়িয়া কাঁদিলে বুঝি বা জ্বালা মিটিবে। কিন্তু লজ্জায় তাহা পারিলেন না।. সকাল হইতে বেলা দশটা পর্য্যন্ত ঘানি ঘুরাইয়া যখন তিনি খাইতে নামিলেন তখন হাতে ফোস্কা পড়িয়াছে, চোখে সরিষার ফুল ফুটিয়াছে, কানে ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকিতেছে।

রবিবারেও কর্ম্মের হাত হইতে নিষ্কৃতি ছিল না। নীচ হইতে বালতি বালতি জল উঠাইয়া দোতলা ও তেতলার বারান্দা নারিকেল ছোবড়া দিয়া ঘষিয়া পরিষ্কার করিতে হইত। এ সব কাজ তবু পারা যাইত, কিন্তু ঘানি ঘোরান অসহ্য ছিল।

উপেন্দ্রনাথ প্রভৃতি যে সকল রাজনৈতিক কয়েদী আন্দামানে ছিলেন, মাঝে মাঝে তাঁহারা কঠোর পরিশ্রম করিতে করিতে

বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের অদৃষ্টে কঠোর শাস্তি জুটিত। একবার কিছুদিন ধরিয়া উপেন্দ্রনাথ বারান্দা সাফ করিতেছিলেন। কাজটা মন্দ লাগিতেছিল না, অন্ততঃ ঘানি টানা বা ছোবড়া পেটার চেয়ে অনেক ভালই লাগিতেছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন জেলার আসিয়া উপেন্দ্রনাথকে ঘানি টানিবার আদেশ দিলেন। সেবার তিনি মরিয়া হইয়া সাফ জবাব দিলেন যে, তিনি ঘানি টানিতে পারিবেন না। উত্তর শুনিয়া জেলার ত অগ্নিশর্ম্মা। উপেন্দ্রনাথ সেলে বন্ধ হইলেন এবং পর্য্যায়ক্রমে তাঁহার হাতকড়ি বেড়ি পরাইবার ও কঞ্জির ব্যবস্থা হইল। শেষে শরীর যখন ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইল, তখন ঘানিতে না পাঠাইয়া তাঁহাকে ছোবড়া পিটাইতে পাঠান হইল।

আন্দামান জেলে কয়েদীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার হইত। সে যে শ্রেণীর কয়েদীই হউক না কেন তাহার উপর উৎপীড়নের অন্ত ছিল না। কষ্ট যখন চরমে উঠিত তখন কোন কোন কয়েদী আত্মহত্যা করিয়া জীবনের সকল জ্বালা জুড়াইত। রাজনৈতিক কয়েদীরা মাঝে মাঝে ধর্ম্মঘট করিত— ঘানিতে কাজ করিতে, অথবা ছোবড়া পেটা প্রভৃতি প্রাণান্তকর কাজ করিতে অস্বীকার করিত। তখন জেলের কর্ত্তৃপক্ষ রুদ্রমূর্ত্তি ধরিতেন। বিদ্রোহী বা ধর্ম্মঘটী কয়েদীদের নানারকম শাস্তির ব্যবস্থা তাঁহারা করিতেন।

সেখানকার জেলে নিষ্ঠুর এবং নির্ম্মম শাস্তি অনেক রকমই ছিল। কখনও পর পর চারিদিন কঞ্জি* খাওয়াইয়া কয়েদীকে রাখা হইত। কখনও বা শাস্তির জন্য দাঁড়া-হাতকড়ির ব্যবস্থা হইত। ইহা ঘরের কড়িকাঠ হইতে বা দেয়াল হইতে ঝুলান হাতকড়ি। কয়েদীকে দাঁড় করাইয়া তাহার হাতে এই হাতকড়ি পরাইয়া চাবি দিয়া দিলে কয়েদীর বসিবার পর্য্যন্ত উপায় থাকিত না। কখনও কখনও চব্বিশ ঘণ্টা, কখনও আটচল্লিশ ঘণ্টা বা তাহারও বেশী সময় কোন কোন কয়েদীকে এমনি কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হইয়াছে। কঞ্জি খাওয়াইয়া কয়েদীকে যখন রাখা হইত, তখন কড়া পাহারা থাকিত। তাহারা দেখিত যে শাস্তিপ্রাপ্ত কয়েদী গোপনে অন্য কোন খাবার যেন সংগ্রহ করিয়া আহার না করিতে পারে। জেলের আইন অনুসারে চারদিনের বেশী ঐ কঞ্জি খাওয়াইবার নিয়ম ছিল না। কিন্তু রাজনৈতিক কয়েদীদিগের কাহাকে কাহাকেও বারো-তেরো দিন ঐ কঞ্জি খাওয়াইয়া শাস্তি দেওয়া হইত। একবার রাজনৈতিক কয়েদী উল্লাসকর দত্তকে সাতদিন দাঁড়া-হাতকড়িতে ঝুলাইয়া রাখা হয়। সাতদিন বাদে হাতকড়ি খুলিতে গিয়া দেখা গেল যে, তিনি জ্বরে অজ্ঞান হইয়া হাতকড়িতে ঝুলিতেছেন। তখনই তাঁহাকে হাসপাতালে পাঠান হইল। সেই রাত্রে তাঁহার

* শুধু চালের গুঁড়া গরম জলে ফুটান।

জ্বর উঠিল একশ' ছয় ডিগ্রী। সকালে দেখা গেল যে, সে জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু উল্লাসকর আর সে উল্লাসকর নাই। বিপদে যিনি ছিলেন নির্ভীক, তীব্র যন্ত্রণায় জর্জরিত হইয়াও যাঁহার মুখ হইতে একদিনের জন্যও হাসির রেখা মুছে নাই—সেই উল্লাসকর দত্ত ঐ সাতদিন একাদিক্রমে হাতকড়িতে ঝুলিয়া, জ্বরে যন্ত্রণায় জর্জরিত হইয়া পাগল হইয়া গিয়াছেন!

আন্দামানের কয়েদীদের শুধু জেলখানার মধ্যে কাজ করিতে হইত না। মাঝে মাঝে তাহাদিগকে জেলের বাহিরেও কাজ করিতে পাঠান হইত। জেলের বাহিরের কাজের মধ্যে ছিল—রাজমিস্ত্রীর কাজ, মাটি কাটা, ইট বহা বা ইট বানান, জঙ্গলে কাঠ কাটা, রিক্স টানা অথবা বাঁধ তৈয়ারী করা। বাহিরে কাজ করার সুবিধার মধ্যে এইটুকু যে—পৃথিবীটাকে দেখিয়া একটু চোখ জুড়াইত, জেলের সঙ্কীর্ণ প্রাচীরের মধ্যে হাঁফ ধরিত, বাহিরে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচা যাইত। কিন্তু বাহিরের কাজে অসুবিধাও ছিল অনেক। বাহিরে সকাল ৬টা হইতে ১০টা আর বিকালে ১টা হইতে ৪৷৷টা পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম ত করিতে হইতই, তা' ছাড়া রোদে পুড়িতে ও বৃষ্টিতে ভিজিতে হইত। জেলখানার মধ্যে বৃষ্টি আসিলে আশ্রয়ের জন্য একটা ছাদ পাওয়া যাইত। বাহিরে সে উপায় ছিল না। উন্মুক্ত আকাশের নীচে দাঁড়াইয়া ভিজিতে হইত। বিশেষতঃ পোর্ট ব্লেয়ারে বৎসরে সাত মাস বর্ষাকাল। তাহার উপর

জঙ্গলে ভীষণ জোঁকের উপদ্রব। তাই জঙ্গলে কাজ করিবার হুকুম হইলে ভয়ে কয়েদীদের অন্তরাত্মা শুকাইয়া যাইত।

একে ত এই কষ্ট, তাহার উপর বাহিরে কাজ করিতে গেলে পূরা খোরাক মিলিত না। কয়েদীর খোরাক চুরি হইয়া বাজারে ও গ্রামে গ্রামে বিক্রয় হইত। সাধারণ কয়েদী হইতে ইউরোপীয় কয়েদী পর্যন্ত সকলেই এ চুরির কথা জানিতেন; কিন্তু চুরি কখনও বন্ধ হইত না। অধিকাংশ কর্মচারীই ঘুষখোর; সুতরাং এ চুরির কোন প্রতিকার হইত না। সাধারণ কয়েদী মুখ বুজিয়া এ অত্যাচার এবং অবিচার সহ্য করে, কারণ সে বিলক্ষণ জানে যে, মুখ খুলিলেই তাহাকে বিপদে পড়িতে হইবে।

অসুখ করিলেও সেখানে শান্তি ছিল না। জেলের হাসপাতালগুলি মনুষ্যবাসের অযোগ্য। হাসপাতালে ছোট ছোট কুঠরী। সেখানে রোগীকে থাকিতে দেওয়া হইত। বৃষ্টির সময়ে পিছন দিকের ঘুলঘুলি দিয়া জল আসিবার বেশ সুব্যবস্থা ছিল এবং পরিষ্কার বায়ু-চলাচলের কোন উপায় কুঠরীতে ছিল না।

আন্দামানের জেলখানার ইহাই মূর্তি। সেখানে সহানুভূতি ছিল না, পরিশ্রম করিতে হইত অমানুষিক। পরিশ্রমের বিনিময়ে খাদ্য বা ব্যবহারটুকুও ভাল জুটিত না। রোগে সুচিকিৎসা বা থাকিবার স্থানটুকুও পর্যন্ত ভাল মিলিত না।

কিন্তু মানুষের সহ্যশক্তিরও একটা সীমা আছে। তাই

মাঝে মাঝে কয়েদীরা বিদ্রোহী হইত, ধর্মঘট করিত। এ বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন রাজনৈতিক কয়েদীরাই। ইঁহারা প্রথম প্রথম নীরবে জেলখানার সকল রকম অবিচার ও অত্যাচার সহ্য করিতেন। পরে প্রতিবাদ করিতে সুরু করেন। ইহাতে তাঁহাদের উপর শাস্তির মাত্রা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। কিন্তু অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতে গিয়া ইঁহারা কোনদিনও ভয়ে পিছাইয়া আসেন নাই।

জেলে ত্রিশ বছর

—ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী

কোন একটা জাতির মধ্যে যখন স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগে তখন শত অত্যাচার নির্যাতন করিয়া তাহাকে দমন করা যায় না। বাংলাদেশে ১৯০৫ সালে যখন স্বদেশী আন্দোলনের জন্ম হইয়াছিল তখন উহাকে দমন করিবার জন্য অনেক আইন করা হইয়াছিল, স্বাধীনতার আন্দোলনকারী বাঙ্গালীদিগকে বেপরোয়াভাবে গ্রেপ্তার করাও হইতেছিল। কিন্তু সে আন্দোলন কখনও মরে নাই। বরং অত্যাচার উৎপীড়ন যত বাড়িয়াছে, অথবা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত স্বাধীনতা যত খর্ব করা হইয়াছে ততই নিষেধ অমান্য করিয়া স্বাধীনতাকে লাভ করিবার ব্যাকুলতা দেশের মধ্যে বাড়িয়াছে।

স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে বাংলার যুবক বৃদ্ধ, জমিদার কৃষক সকলেই দেশপ্রেমে মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। সকলের মনেই তখন নূতন উৎসাহ, অসীম আশা—দেশ স্বাধীন হইবে, পরাধীনতার গ্লানি দূর হইবে! সেই যে আন্দোলন তখন সুরু হইয়াছিল তাহার প্রবল বন্যায় অনেক বাঙ্গালী তাঁহাদের

জীবনতরী ভাসাইয়াছিলেন। কেহ কেহ ২৫।৩০ বৎসর পর্যন্ত কারাবাসেই জীবন কাটাইয়া দিয়াছেন। তবু একদিনের জন্যও তাঁহারা নতিস্বীকার করেন নাই, বা অন্যায়ের সঙ্গে সন্ধি করেন নাই। স্বাধীনতার সংগ্রামে নামিয়া যাঁহারা সুদীর্ঘকাল কারাবাস করিয়াই জীবনটা অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী অন্যতম। ভারতবর্ষের মধ্যে,—শুধু ভারতবর্ষ কেন, সম্ভবতঃ পৃথিবীর মধ্যে রাজনৈতিক কারণে সর্বাপেক্ষা অধিক বৎসর যাঁহারা কারাবাসে কাটাইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর চেয়ে বেশী দিন কেহই কারাবাস করেন নাই। তাঁহার জীবনের ত্রিশ বৎসরই কারাগারে কাটিয়াছিল।

কারাগারে তিনি বারীন ঘোষ, পুলিন সরকার প্রভৃতির সহিত ছিলেন। সাভারকর, ভাই পরমানন্দ, পৃথ্বী সিং প্রভৃতির সঙ্গে ছিলেন। মান্দালয় জেলে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সহিত তিনি কাটাইয়াছেন। মাদ্রাজের বিভিন্ন জেলে যখন তাঁহাকে ঘুরান হইয়াছে, তখন অধ্যাপক এন্. জি. রঙ্গ, মালাবার বিদ্রোহের নেতা এম্. পি. নারায়ণ মেনন প্রভৃতির সহিত তিনি একত্র ছিলেন।

বহু বৎসর তিনি সাধারণ কয়েদীর মত ছিলেন, দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদী ছিলেন, বিশেষ শ্রেণীর কয়েদীও ছিলেন। তিনি ষ্টেট প্রিজনার ছিলেন, ডেটিনিউ ছিলেন, সিকিউরিটি বন্দী ছিলেন,—আবার অন্তরীণাবদ্ধও ছিলেন। জেলখানার পেনাল

কোডে যে সব শাস্তিব কথা লেখা আছে এবং যেসব শাস্তির কথা লেখা নাই, তাহাব প্রায় সবই তিনি ভোগ করিয়াছেন।

স্বাধীনতাব স্বপ্নে বিভোব হইয়া ত্রৈলোক্যনাথ জেলখানাব সকল অত্যাচাব উৎপীড়ন অনায়াসে সহ্য করিয়াছিলেন। জেলেব খাওয়ায় তাঁহার পেট ভবিত না, বাত্রে মশার কামড়ে ঘুম হইত না। জেলে তিনি গম পিষিয়াছেন, ঘানি টানিয়াছেন। তাঁহার গায়ে জোব ছিল, মনে উৎসাহ ছিল,—তাই এ সব কঠোব কাজ কবিতে বিশেষ কোন কষ্ট তিনি বোধ করেন নাই। অবশ্য প্রথম প্রথম ঘানি টানিতে তাঁহার মাথা ঘুরিয়াছে, জলপিপাসা পাইয়াছে; কিন্তু কিছুদিন পরেই সে কষ্ট তাঁহাব গা-সহা হইয়া গিয়াছিল।

ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী যখন তাঁহার কাবাজীবন আরম্ভ করেন তখন কাবাগারের বিধি-ব্যবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। কয়েদীরা তখন মানুষেব মধ্যেই গণ্য হইত না, হিংস্র পশু বলিয়া তাহাদিগকে মনে কবা হইত এবং তেমনই কঠোর ব্যবহাব তাহাদেব প্রতি করা হইত। তখন কথা ছিল Jail hell—অর্থাৎ আমাদের শাস্ত্রে নবকের যে বর্ণনা আছে তখনকার দিনের জেলের সহিত তাহাব তুলনা করা যাইতে পারে। ত্রৈলোক্যনাথ বলিয়াছেন, "তখনকার জেল তিনটি জিনিসের জন্য বিখ্যাত ছিল। ফাইল, গাইলং এবং ডাইল।" জেলখানায় দিনের মধ্যে বহুবাব কয়েদীদের গোণা হইত—কেহ পলাইল

কিনা ইহা দেখিবার জন্য। ফাইল করিয়া জোড়ায় জোড়ায় বসিতে হইত, জোড়া জোড়া চলিতে হইত, বে-ফাইলে চলিবার জো ছিল না। বে-ফাইলে পা বাড়াইলেই বিপদ্। স্নান করা, খাওয়া সবই ফাইল অনুসারে। দেরী করিবার উপায় ছিল না, 'সরকার' বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই দাঁড়াইতে হইত। নতুবা রক্ষা ছিল না। 'গাইল' (গালি) জেল কর্ম-চারীদের মুখে লাগিয়াই ছিল। আর, জেলখানার খাদ্যের মধ্যে 'ডাইল'ই (ডাল) ছিল প্রধান অবলম্বন। কারণ ধান ও পাথরের জন্য ভাত খাওয়া যাইত না, তরকারীও খাইতে প্রবৃত্তি হইত না। কাজেই 'ডাইল'ই ছিল একমাত্র সম্বল। সে সময়ে সপ্তাহে ছয় দিনই কলাইয়ের ডাল দেওয়া হইত প্রত্যহ ঐভাবে কলাইয়ের ডাল দিবার একটা পুরাণো ইতিহাস ত্রৈলোক্যনাথ কয়েদীদের নিকট হইতে শুনিয়াছিলেন। তাহা এই—

পূর্বে এক এক দিন এক এক রকমের ডাল কয়েদীদিগকে পরিবেশন করা হইত। একবার জেলের আই. জি. জেল পরিদর্শন করিতে আসেন। কয়েদীরা তাঁহার কাছে মাছ খাইবার প্রার্থনা জানাইল। তাহারা বলিল, "হুজুর, আমরা মাছ খাইতে চাই।" আই. জি. সাহেব, বাংলা তিনি জানিতেন না। সুতরাং কয়েদীরা কি প্রার্থনা করিতেছে তাহা তিনি জেলার বাবুর কাছে জানিতে চাহিলেন। জেলার বাবু

তৎক্ষণাৎ আই. জি. কে বুঝাইয়া দিলেন যে, কয়েদীরা 'মাষ কলাইয়ের ডাল' খাইতে চায়। আই. জি. জিজ্ঞাসা করিলেন, এ ডাল কি খুব দামী? জেলার বাবু বলিলেন, "না তেমন বেশী দাম নয়"। তখন আই. জি. হুকুম দিয়া গেলেন, "খুব মাষ দেও।" তখন হইতে মসূরী ও ছোলাব ডাল জেলখানা হইতে মুক্ত হইল। নিত্যই মাষ কলাইয়েব ডাল জেলে আসিতে লাগিল। এই গল্প সত্য কিনা কে জানে, কিন্তু মাষকলাইয়ের ডাল যে নিত্যই কয়েদীদের দেওয়া হইত তাহা সত্য।

আন্দামানের জেলে ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীব বিচিত্র অভিজ্ঞতা হইয়াছিল। বিপ্লবী 'বলিয়া তাঁহাব ১৫ বৎসরের দ্বীপান্তব বাসের দণ্ডাজ্ঞা হইয়াছিল। দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হওয়ার পর আন্দামান যাত্রা করার পূব পর্যন্ত তিনি দমদম প্রেসিডেন্সী জেলে প্রায় নয় মাস ছিলেন। সেখানে তাঁহাকে নির্জন সেলে রাখা হইয়াছিল। নির্জন নিঃসঙ্গ কারাবাসেব মত ভয়ঙ্কর জিনিস আর নাই। ইহাতে মানুষ পাগল পর্যন্ত হইয়া যায়। ত্রৈলোক্যনাথকে এই ভয়ানক নির্জন নিঃসঙ্গ কাবাবাস জীবনে কতবার এবং ক্রমান্বয়ে কতকাল যে ভোগ করিতে হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

আন্দামানে যাইবার পূবে নির্জন সেলে বসিয়া তিনি কত কথা চিন্তা করিতেন। ভাবিতেন—হয়ত তিনি চিরদিনের জন্য দেশ হইতে বিদায় লইয়া যাইতেছেন। আক্ষেপে মন ভরিয়া

উঠিত এই ভাবিয়া যে, বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন কাহারও সহিত দেখা হইল না, কাহাকেও দুইটা কথা বলিয়া যাইতে পারিলেন না, কাহারও নিকট হইতে বিদায় লইবার সুযোগ-টুকুও তিনি পাইলেন না। যাইবার আগে সেলের দেয়ালে সুরকি দিয়া তিনি লিখিলেন—

বিদায় দে মা প্রফুল্ল মনে যাই আমি আন্দামানে,
এই প্রার্থনা করি মাগো মনে যেন রেখো সন্তানে।
আবার আসিব ভারত-জননী মাতির সেবায়,
তোমার বন্ধনমোচনে মাগো যেন এ জীবন যায়।
ইত্যাদি।

নির্দিষ্ট দিনে ত্রৈলোক্যনাথ এবং আরো অনেক কয়েদীকে আন্দামানের জন্য রওনা করা হইল। তাঁহাদের হাতে হাতকড়ি পায়ে বেড়ি আগে হইতেই ছিল, এখন কোমরে দড়ি বাঁধা হইল। তারপর বন্দুকধারী পাহারাদারদিগকে চারিপাশে সাজাইয়া তাঁহাদিগকে জাহাজে পোরা হইল।

তিন দিন তিন রাত্রি জাহাজে থাকিয়া, চতুর্থ দিনে বেলা দশটায় তাঁহারা পোর্ট ব্লেয়ারে পৌঁছান। পথে তাঁহাদের খাইবার ব্যবস্থা ছিল চিঁড়া ও গুড়। কিন্তু উহা খাইবার উপায় ছিল না। কারণ, জাহাজ এমন দুলিতেছিল যে সমুদ্র-পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া কেহই মাথা পর্যন্ত তুলিতে পারে নাই। উঠিলেই সকলের বমি হইতেছিল।

সকালে ও বিকালে হাওয়া খাওয়াইবার জন্য সমস্ত কয়েদীদিগকে জাহাজের উপর লইয়া যাওয়া হইত। ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ যখন উপরে উঠিত তখন মনে হইত, জাহাজখানা বুঝি বা আকাশ ছুঁইবে, আর নীচের দিকে যখন নামিত তখন মনে হইত যে উহা বুঝি বা পাতালপুরীতে চলিল।

স্থান হিসাবে আন্দামান বড় অস্বাস্থ্যকর জায়গা। কিন্তু সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য খুবই সুন্দর। সমুদ্রের উপর পাহাড়, দ্বীপের উপর নারিকেল গাছেব সারি সূর্যের আলোয় পাতার ঝালর দুলাইতেছে, দেখিয়া চোখ জুড়াইয়া যায়।

জেলে পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গেই কয়েদীদের পায়ের বেড়ী কাটিয়া দেওয়া হইল। ইহাতে সকলকারই মনে হইতেছিল যে, পা বুঝি খুব হাল্‌কা হইয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে তল্লাসী সুরু হইল—কেহ যদি তাহাদের সঙ্গে টাকাপয়সা লইয়া আসিয়া থাকে ইহা দেখিবার জন্য। তল্লাসীতে প্রহরীরা পয়সা পাইল না। তবে কাহারও কাহারও পৈতা পাইল। উহা তাহারা কাড়িয়া লইল। উপেন্দ্রনাথ ইহাতে আপত্তি করেন। কিন্তু আপত্তিতে কোন ফল হয় নাই।

বর্মা ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত হইয়া কয়েকজন রাজনৈতিক বন্দী ঐ সময়েই আন্দামানে আসেন। তাঁহাদের মধ্যে পণ্ডিত রামরক্ষা নামে একজন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পৈতা কাড়িয়া লওয়ায় তিনি অনশনব্রত গ্রহণ করেন।

তিন মাস অনশন করার পর তাঁহার মৃত্যু হয়, তথাপি তাঁহাকে তাঁহার পৈতা দেওয়া হয় নাই।

আন্দামানে জেলার আর সুপারিন্টেণ্ডেণ্টই কারাগারের মধ্যে সর্বেসর্বা। তাঁহাদের বিরুদ্ধে কাহারও নিকট কোন অভিযোগ করার উপায় ছিল না। সেখানে প্রত্যেক কয়েদী বছরে একখানা চিঠি লিখিতে পারিত এবং একখানা চিঠি পাইতে পারিত। কিন্তু সেই এক বৎসরের মধ্যে তাহার যদি কোন অপরাধের জন্য দণ্ড হইত তাহা হইলে এই অধিকারটুকুও কাড়িয়া লওয়া হইত। আন্দামান জেলের খাওয়া ভারতের যে কোন কারাগারের খাওয়া হইতে খারাপ। সস্তা রেঙ্গুনের আতপ চাউলের ভাত, সারা বৎসর দুই বেলা অড়হর ডাল এবং অখাদ্য ঘাসপাতার তরকারি, ইহাই ছিল নিত্যকার খাদ্য। সারা বছরের মধ্যে মাত্র দুই এক দিন মাছের ঝোল অথবা মাছসিদ্ধ পাওয়া যাইত। রাত্রে জেলে কোন আলোর ব্যবস্থা ছিল না। কয়েদীরা জল পাইত অতি অল্প।

ত্রৈলোক্যনাথের হাঁপানির অসুখ ছিল। সুতরাং সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট যখন তাঁহাকে কঠোর কাজ করিবার হুকুম দিলেন তখন তিনি একবার আপত্তি জানাইয়া বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার হাঁপানি আছে। উত্তরে তিনি ধমক খাইলেন। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বলিলেন, "ইহা আন্দামান। এখানে কোন ওজরআপত্তি খাটিবে না।" অসুখ লইয়াই তাঁহাকে ছোবড়া পিটিতে হইত। ইহা জেলের মধ্যে কঠিন কাজ বলিয়াই গণ্য।

আন্দামানে প্রতিমাসে গড়পড়তা তিনটি করিয়া লোক আত্মহত্যা করিত। মানুষ সহজে আত্মহত্যা করিতে চায় না। কিন্তু সেখানে কয়েদীদের প্রতি এত অত্যাচার করা হইত যে, তাহারা তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিয়া সকল যন্ত্রণার হাত হইতে রক্ষা পাইত।

জেলখানায় মাঝে মাঝে মজার ব্যাপারও হইত। শের সিং নামে একজন পাঞ্জাবী শিখ ত্রৈলোক্যনাথদের সঙ্গে আন্দামানে ছিল। সে খুব বলিষ্ঠ। একা একটা গোটা পাঁঠা খাইবার সামর্থ্য তাহার ছিল। তাই জেলখানার খাবার খাইয়া তাহার পেট ভরিত না। সে মাঝে মাঝে বলিত, এখানকার খাদ্য না খাওয়াই ভাল, খাইলে আরও ক্ষুধা বাড়ে। একদিন এই শের সিংকে হাসপাতালের ডাক্তার এক বালতি দুধ দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, "শের সিং, তুমি এই এক বালতি দুধ খাইতে পার?" বালতিতে দশ সের দুধ ছিল। শের সিং "হা পারি"—বলিযা তৎক্ষণাৎ বালতিতে চুমুক দিয়া তাহা শেষ করিয়া দিয়াছিল।

আর একবার ত্রৈলোক্যনাথের কোন এক বন্ধু গোপনে তাঁহার কাছে দুইটা তামাকপাতা পাঠাইয়া দিয়া উহার বদলে তাঁহাকে এক সের সরিষার তেল জোগাড় করিয়া দিবার জন্য বলিয়াছিলেন। ত্রৈলোক্যনাথ ঘানিঘরের একটা লোককে ঐ তামাকপাতা দুইটি দিয়া এক সের পরিমাণ তেল সংগ্রহ

করিয়া লইয়া আসিতেছিলেন এমন সময়ে তিনি ধরা পড়িয়া গেলেন। প্রহরী তাঁহাকে মালসমেত ধরিয়া লইয়া যাইবে, এমন সময়ে শের সিং সেখানে আসিয়া কি হইয়াছে জানিতে চাহিল। প্রহরী বলিল এই বাঙ্গালী তেল চুরি করিতেছিল, আমি ধরিয়াছি। শের সিং বলিল, "তাই ত ভারি অন্যায়। তা দেখি, কতখানি তেল।" এই কথা বলিয়া প্রহরীর হাত হইতে তেলের বাটিটা লইয়া এক চুমুকে সে সমস্ত তেলটা খাইয়া ফেলিয়া বাটিটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। প্রহরী জব্দ হইয়া গজ গজ করিতে করিতে চলিয়া গেল। কারণ, তাহার সাক্ষী ছিল না, আর মালও শের সিংয়ের পেটে গিয়াছে!

আন্দামানে কয়েদীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার হইত। উহার প্রতিকার হিসাবে ত্রৈলোক্যনাথ প্রভৃতি কয়েকজন রাজনৈতিক বন্দী জেল আইন অমান্য করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। নরমপন্থীগণ ইহাতে যোগ দেন নাই। বন্ধুদের নিষেধ সত্ত্বেও অসুস্থ শরীর লইয়া ত্রৈলোক্যনাথ এই আইন অমান্যকারীদের দলই বাছিয়া লইয়াছিলেন।

আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হইল। আইন অমান্য-কারীরা ঘোষণা করিলেন—তাঁহারা স্বাধীন। কাহারও কোন হুকুম তাঁহারা মানিতেন না, জেলের সাজারও তাঁহাদের কোন ভয় ছিল না। জেলে পরস্পর কথা বলা নিষেধ ছিল। কিন্তু

আইন অমান্যকাবী বাজনৈতিক কয়েদীবা পবস্পব কথা বলিতেন, খাবাব খাবাপ ও কম বলিয়া হৈ চৈ কবিতেন, কোন কয়েদীকে কোন জেল কর্মচাবী প্রহাব কবিলে ইঁহাবা একজোট হইয়া তাহাতে বাধা দিতেন। এই সব অপবাধেব জন্য ইঁহাদেব হাতকড়িব ব্যবস্থা হয়, ইঁহাদিগকে নানাবকম বেড়ী পবাইযা শাস্তি দেওযা হয, সেলে আবদ্ধ কবিয়া বাখা হয। কিন্তু অন্যাযেব প্রতিবাদ কবিতে যাইযা এই আইন অমান্যকাবী কযেদীব দল সকল শাস্তি নির্বিবাদে ভোগ কবিতেন।

এই সময়ে একবাব পাঞ্জাব ও আমেদাবাদ হইতে আন্দামানে কিছু মার্শাল ল'ব কযেদী আসিযাছিল। আসিতেই তাহাদিগকে ঘানি টানিতে দেওয়া হইল। কিন্তু তাহাবা সত্যাগ্রহেব কযেদী। তাহাবা সত্যাগ্রহ আবন্ত কবিয়া দিল,—বলিল যে, "আমবা ঘানি টানিব না।" এই কথা বলিয়া তাহাবা ঘানিঘবে শুইয়া পডিল। কিন্তু জেলাব হুকুম দিলেন, তাহাদেব হাত পা বাঁধিযা ঘানিব সহিত জুডিযা ঘানি ঘুবাণ হউক। জেলাবেব হুকুম তামিল হইল। ফলে ঐ সকল সত্যাগ্রহী কযেদী যাহাদেব ঘানিব সহিত বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল তাহাদেব পিঠ ও হাতপায়েব চামড়া উঠিয়া গেল।

শীঘ্রই এই সংবাদ ত্রৈলোক্যনাথ প্রভৃতিব কানে গেল। তাঁহাবা ইহা লইয়া হৈ চৈ আবম্ভ কবিয়া দিলেন। ফলে জেলের কর্তৃপক্ষ মার্শাল ল'ব কয়েদীদেব ঘানি টানা হইতে

মুক্ত করিলেন। কিন্তু আন্দোলনকারীদিগকে সেলে পুরিলেন। এই সময়ে একদিন জেল সুপারিন্টেণ্ডেন্ট জেল পরিদর্শনে আসিয়াছেন। ত্রৈলোক্যনাথ তাঁহার সেলের লৌহদ্বারের পিছন হইতে সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মার্শাল ল'র বন্দীদের উপর অত্যাচার করা হইল কেন?" তাঁহার এইরূপ কৈফিয়ৎ চাওয়ায় সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ক্ষেপিয়া গিয়া ত্রৈলোক্যনাথকে গালি দিলেন। ত্রৈলোক্যনাথও উপযুক্ত উত্তর দেওয়ায় সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মহাশয় গুটি গুটি সেখান হইতে সরিয়া পড়েন। অফিসে গিয়াই তিনি হুকুম দেন যে, ত্রৈলোক্যনাথ বড় বেয়াদব কয়েদী। তাঁহাকে চারদিন পেনাল ডায়েটে রাখা হইবে অর্থাৎ দুইবেলায় মাত্র আধসের করিয়া ভাতের ফেন খাইয়া চারি দিন কাটাইবার হুকুম তাঁহার উপর হইল।

তিনি যে সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে গালির উত্তরে গালি দিয়াছিলেন সে সংবাদ অবিলম্বে জেলের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। খাবার সময়ে পাচক আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কি খাইতে চাহেন, ভাত না রুটি? তিনি বলিলেন, "কেন, আমার সাজা হইয়াছে। আমাকে ফেন দাও।" উত্তরে পাচক বলিল, "আমরা আপনার বাহাদুরির কথা শুনিয়াছি। আপনাকে ফেন দিবার হুকুম আমাদের কাছে আসিয়াছে সত্য। কিন্তু ফেন আমরা আপনাকে দিব না। আপনি যাহা খাইতে চান, আমরা আপনাকে তাহাই দিব।" ইতিমধ্যে

তাঁহার জন্য আনীত ফেনের বাটিটা টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, "ইয়ে বাঙ্গালী শের হ্যায়, ডবল খানা দেও।" ইহার পর ত্রৈলোক্যনাথের সেলে রাশি রাশি রুটি, চাটনী প্রভৃতি গোপনে আসিয়া জড় হইতে লাগিল। কোন একদিনও তাঁহার খাইতে হইল না। বরং ঐ খাবার তিনি সকলকে বিলাইয়া খাইতে লাগিলেন। কারণ, অত খাবার তাঁহার একার পক্ষে খাওয়া অসম্ভব ছিল।

আন্দামানে অন্যায়েব প্রতিবাদ করিয়া যাঁহারা খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ত্রৈলোক্যনাথ ছিলেন অন্যতম। বেত ছাড়া জেলের সকল রকম সাজা ত্রৈলোক্যনাথ সহ্য করিয়াছিলেন। ক্রস বার ফেটার্স (সাধাবণত বেতের পরিবর্তে এই সাজা দেওয়া হয়), ডাণ্ডা বেড়ী, শিকলী বেড়ী খাড়া হাতকড়ি, পিছনে হাতকড়ি, রাত্রে হাতকড়ি, পেনাল ডায়েট, সেল বাস প্রভৃতি সমস্ত সাজাই তিনি ভোগ করিয়াছিলেন। এক একবার এক একটা করিয়া অন্যায়েব বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন করিয়াছিলেন এবং এক একটা সাজা তিনি লাভ করেন।

আন্দামানে ইঁহাদের আইন অমান্য আন্দোলন প্রায় তিন বৎসর চলে। বেড়ী পায়ে দিতে দিতে তাঁহাদের অনেকেরই পায়ে কড়া পড়িয়া গিয়াছিল। বেড়ী পরিতে পরিতে তাঁহারা এমন অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিলেন যে, উহা পায়ে দিয়া দৌড়াইতে পাবিতেন। মাঝে মাঝে কম্বলের ভ 'কে পাকাইয়া ফুটবল করিয়া লইয়া তাঁহারা

য়াছেন।